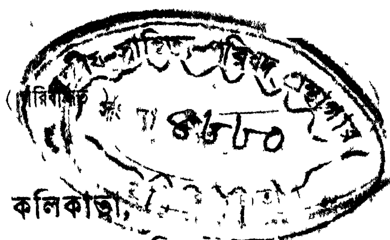
শোণিতাঞ্জলি।

"ত্রিশূল" পত্রে প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর

লিখিত প্রস্তাব।



কলিকাতা,

শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা দ্বারা প্রকাশিত

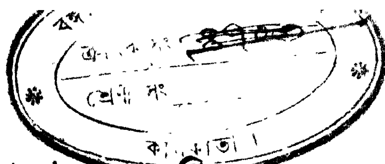
ও

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৫

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।



প্রকাশকের নিবেদন।

"শোণিতাঞ্জলি" নাম দেখিয়া, নভেল নাটকের পাঠকগণ, ইহাকেও হঠাৎ নভেল নাটক শ্রেণীর একখানি পুস্তক মনে করিতে পারেন; বস্তুতঃ ইহা ঐ শ্রেণীর পুস্তক নহে। নভেল নাটক শ্রেণীর পুস্তক না হইলেও, নভেল নাটকের কল্পনা রাজ্য হইতেও বিচিত্র এক ভীষণ শোণিতসমুদ্রের কথার আলোচনা, পাঠকগণ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে পৃথিবীর তিনটা মহাদেশে,—এসিয়া, আফ্রিকা ও ইয়োরোপে আজি নর-শোণিতের যে ত্রিধারা বহিয়া চলিয়াছে, ইহার অন্তিম সঙ্গমক্ষেত্র, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমভূমির কতদূর উত্তরপশ্চিম বা পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে কি ভাবে এবং কোন্ সময়ে সংঘটন হইবে, এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর, এখনও এ দেশের কি বিদেশের রাজনীতিজ্ঞ কোন মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই। ইহা হইবার সম্ভাবনাও নাই। যে চিন্তার শৃঙ্খলকে ধরিয়া,—যে গণনার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ, সুদূর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ভিতরেও তাঁহাদের ত্রিকালভেদী দৃষ্টিকে প্রবিষ্ট করাইতে পারিতেন, সে চিন্তা ও সে গণনা-পদ্ধতি এখন এদেশে বিলুপ্ত। তথাপি তাঁহাদের সঙ্কলিত পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে এখনও যে উহার পথনির্দ্দেশক চিহ্ন-শিলা দুই চারিটা দেখিতে না পাওয়া যায়, এমত নহে। প্রধানতঃ এইরূপ

শাস্ত্রীয় চিহ্নশিলাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, "ত্রিশূল" মাসিক পত্রে, বর্ত্তমান যুদ্ধ ব্যাপারের পরিণাম ফল সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে যে সকল সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। যে কয়েক সংখ্যা "ত্রিশূলে" এই প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হওয়াতে এবং অনেকে উহা দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে, ইহা এইভাবে ছাপিয়া পুনঃ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। প্রবন্ধ কয়েকটীর মূল লক্ষ্যীভূত বিষয় এক হইলেও বিভিন্ন সময়ে উহা লিখিত ও "ত্রিশূলে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ সকল প্রবন্ধকে পুস্তকাকারে একসূত্রে গ্রথিত করিবার অনুরোধে উহার স্থল বিশেষে একটু আধটু হ্রাস বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি হওয়াতে, লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে তাহা করিয়া দেওয়া হইল। "শোণিতাঞ্জলি" নাম ইহার কেন যে দেওয়া হইল, এ কথার উত্তর, পাঠকগণ এই পুস্তক মধ্যেই পাইতে পারিবেন ইতি।

কাশী,
২২শে আষাঢ় ১৩২৫।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা।
প্রকাশক।

—o—

শোণিতাঞ্জলি।

—•❖•—

রণক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ।

আকাশ মেঘে ঢাকিলে মধ্যাহ্নের সূর্য্যও অদৃশ্য হয়। সেইরূপ দুঃসময় উপস্থিত হইলে, মানুষের বিবেচনা শক্তিও কতকটা বিলুপ্ত হইয়া যায়। আজি একটা অভাবনীয় ব্যাপারে হঠাৎ এই কথার সত্যতা সুপ্রমাণিত হইতে বসিয়াছে।

যেমন এক এক সময়ে, ওলাউঠা, ডেঙ্গু, প্লেগ, বেরিবেরি, প্রভৃতি এক একটা উৎকট সংক্রামক পীড়ার প্রবাহ দেশের এক একটা দিকের উপর দিয়া চলিয়া যায় আর তাহার ফলে সেই সকল স্থানের কতকগুলি প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি সমাজের উপর দিয়া এক এক সময়ে এক একটা বিকট হুজুগের তরঙ্গও চলিয়া যাইতে দেখা যায় আর তাহার ফলে সমাজের নিম্ন স্তরের কতকগুলি লোক নানা দিক দিয়া নানা বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে "স্বদেশী" আন্দোলনের একটা দেশব্যাপী হুজুগ উঠিয়াছিল। সম্প্রতি এ দেশে এইরূপ আর একটা হুজুগের প্রবল স্রোত চলিয়াছে। এই হুজুগের নাম—"আমরা Conscrip-

tion law চাই", অর্থাৎ জোর জবরদস্তি করিয়া আমাদের এদেশের যুবকগণকে ধরিয়া সৈন্য সাজাইতেই হইবে আর সেইজন্য এখন একটা আইন পাশ হওয়াই চাই।

বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে, যুদ্ধে লিপ্ত উভয় পক্ষেরই যুদ্ধক্ষেত্রে লোকবল বৃদ্ধি করিবার নিরতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। উভয় পক্ষেরই পূর্ব্ব সঞ্চিত লোক-বল ও অর্থ-বল এবং সৈন্যদের দৈহিক বল রক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপাদান আহার্য্য সামগ্রী বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ায় উভয়কেই চিন্তাকুল হইতে হইয়াছে এবং উভয়কেই এই সকল সামগ্রী সংগ্রহের জন্য চারি পাশে এখন হাত বাড়াইয়া বেড়াইতে হইতেছে। রুসিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন হওয়ায়, জর্ম্মণীর সম্প্রতি এই সকল সামগ্রী সংগ্রহের একটা প্রশস্ত দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই জর্ম্মণীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ডকেও যুদ্ধের এই সকল অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তাহার অফুরন্ত ধন ও লোকবল-ভাণ্ডার ভারতভূমির দিকে এখন হাত বাড়াইতে হইয়াছে। ভাণ্ডারের কোন কোন কক্ষের লৌহদ্বার —যাহা এতদিন অর্গলাবদ্ধ ছিল—তাহা কতকটা এই কারণে এখন খুলিয়া দিতে হইতেছে। সৈন্যদলে প্রবেশ লাভের অধিকার, হঠাৎ এই কারণে হাতে পাইয়া, বাঙ্গালী যুবক আজি আনন্দে একটু দিশেহারা হইয়া উঠিয়াছেন। জন কতক বাঙ্গালী যুবককে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া, সমাজের পরিচালক স্থানীয়গণের কেহ কেহ আনন্দে অধীর হইয়া দেশের সমস্ত যুবককে আইন করিয়া যোদ্ধা প্রস্তুত করিবার প্রার্থনা করিতে বসিয়াছেন।

আবার যুবকদের মধ্যেও কতকগুলি লোক ইঁহাদের আনন্দ দেখিয়াই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, সৈন্যের লাল পোষাকে এবং বাঁকা টুপিতে আপনাকে সুসজ্জিত করিবার জন্য কিছু অতিমাত্রাতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের বাধা প্রভৃতি নানা কারণে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ আইন পাশের হঠাৎ এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহবা দেশের ভাবী মঙ্গল কামনার সহিত সৈন্যদলে মিশিবার বাসনাকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়া নিজেদের ক্ষীণকণ্ঠ চীৎকার দ্বারা এই প্রার্থনার উচ্চনাদকে আরও পরিপুষ্ট করিতেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই চিত্ত, স্রোতের বেগে ভাসিয়া আসিয়া এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ইহাঁরা হুজুগ-বন্যার চুনা পুঁটি। ইহারা লাভালাভ ভালমন্দ কোন কিছুরই চিন্তার ধার ধারেন না,—ইহারা কোন চিন্তা করিতেই আদৌ অভ্যস্ত নহেন,—নূতন একটা হুজুগ আসিলেই তাহাতে ভাসিয়া যাওয়াই কেবল ইহাদের কার্য্য।

গবর্ণমেণ্টের এসময়ে সৈন্যের অত্যধিক প্রয়োজন, আর দেশের কতকগুলি লোকও যখন সৈন্য সাজিতে ইচ্ছুক, অতএব এ সময়ে "Conscription আইন পাস করা হউক" এমন একটী প্রার্থনার কথা তুলিয়া উভয়কে সন্তুষ্ট করিবার এরূপ সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতে নাই মনে করিয়াও কেহ কেহ এই হুজুগে কোমর বাঁধিয়া নামিয়াছেন। এ দেশের মফস্বলবাসী কতকগুলি অৰ্দ্ধশিক্ষিত ধনবান্ জমিদার যুবক এবং সহরবাসী কতকগুলি মধ্যশ্রেণীর

উৎসাহী পুরুষ, তাঁহাদের সম্মুখে যে কোনরূপ একটা নূতন হুজুগের স্রোত আসিয়া পড়িতে দেখিলেই, তাহাতে যাইয়া অঙ্গ ভাসাইয়া দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ইঁহাদের প্রকৃতি নিঃশব্দে কোন কার্য্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে আদৌ অভ্যস্ত নহে। হট্টগোলে ইঁহাদের কার্য্য আরম্ভ এবং ইঁহাদের কার্য্যের মধ্যেও মহাগোল আর বিশাল গোলমালেই ইঁহাদের কার্য্যের পরিসমাপ্তি। "Conscription law চাই" রূপ যে একটা নূতন হুজুগ উঠিয়াছে, এ হুজুগের পরিপোষণও কতকটা ইঁহারাই করিতেছেন। এ অবস্থাতে এই হুজুগে মাতিয়া এদেশে এখনই "Conscription law পাশ করা হউক" বলিয়া কতকগুলি যুবক যে ইদানীং একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমাদের বিস্মিত হইবার বিশেষ কোনই কারণ নাই;—বিস্মিত না হইলেও, ব্যথিত হইতে হয় এই দেখিয়া যে, যাঁহারা আমাদের সমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এবং সমাজের পরিচালক বলিয়া আপনাদিগকে সুপরিচিত করিতে প্রয়াসী, এমন কোন কোন বৃদ্ধও তরলমতি যুবক এবং বালকদের সঙ্গে এ হুজুগ-স্রোতে সমান গা ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। সমাজ-মঙ্গল-চিন্তার দিক দিয়া ইহার ভাল মন্দ দোষ গুণের এবং ভবিষ্যৎ ক্ষতি বৃদ্ধির ভাবনা কিছুই ইহাঁরা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। কিন্তু সুখের বিষয়, সকলেই এরূপ নহেন; কেহ কেহ কথাটা লইয়া একটু চিন্তাও করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহাদিগের এ দিকে একটু ভাবনা করিবার প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু ভাবনা করিবার অবসর নাই এবং চিন্তার উপাদান হাতের নিকটে

উপস্থিত নাই, তাঁহাদের চিন্তার সুবিধার্থে আজি আমি এখানে এ সম্বন্ধে গুটি দুই চারি কথার আলোচনা করিব।

পূজার বাড়ীতে ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁসর বাজিয়া উঠিলে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরা মুখে ডিডিং ডিডিং শব্দ করিয়া নাচিতে থাকিবে, ইহা তো স্বাভাবিক; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে যদি বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরও কোসা কুসি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া, কোমরে নামাবলী জড়াইয়া, বালক-বালিকাদের সঙ্গে বাদ্যের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিয়া দেন, তাহা হইলে সে দৃশ্য একদিকে যেমন হাস্যোদ্দীপক হয়, অপর দিকে তেমনি নিদারুণ কষ্টদায়কও হয়। কেন এরূপ হয়, বলিতে পার কি? যাহার অবস্থার উপযোগী যে কার্য্য নহে, তাহাকে সেই কার্য্য করিতে দেখিলেই, ক্ষেত্র অনুসারে এইরূপ হাসিতে বা কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। যাঁহারা জাতিগত বৃত্তি, মানসিক প্রবৃত্তি এবং দেহবল-সম্পদে সৈন্যদলে প্রবেশের সম্পূর্ণ যোগ্য, এমন ক্ষত্রিয় রাজপুত এবং গোয়ালা, জালিয়া, মালিয়া, বাগ্দী, কাহার, নমশূদ্র প্রভৃতিকে— অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোসন পাইবার প্রবল লালসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন,—তাঁহাদিগকে এ সময়ে সৈন্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক দেখিলে আমাদের যেরূপ আনন্দের কারণ উপস্থিত হয়, পক্ষান্তরে ক্ষীণদৃষ্টি, দুর্ব্বলবাহু, কম্পিতপদ ব্রাহ্মণযুবককে তাঁহার বগলের পুঁথি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বন্দুক ঘাড়ে লইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে দেখিলে তেমনি কষ্টানুভব করিতে হয়। সাধারণতঃ এদেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ এখন দৈহিক শ্রম-সাধ্য কার্য্যে আত্মনিয়োগের ক্ষমতা একরূপ হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থাতে বল প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যুবকগণকে ধরিয়া সৈন্য সাজাইতে বসিলে, ছাগ দ্বারা বলদের গাড়ী টানাইবার নিষ্ফল চেষ্টার ন্যায় কেবল বিড়ম্বনা বৃদ্ধিই সার হইবে। যুদ্ধ ব্যাপারের যে অংশে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিবার জন্য এ দেশের ব্রাহ্মণ যুবকগণের স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে, সেরূপ কোন কার্য্যে তাঁহাদিগকে ব্রতী হইতে আহ্বান করিলে তাহাতে যেরূপ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা, তদ্বিপরীতে ন্যায়দর্শন অধ্যয়নকারী ভট্টাচার্য্য-তনয়কে ধরিয়া তিনকড়ি ঘোষের ভ্রাতা আর পাঁচু কর্ম্মকারের পুত্রের সহিত ট্রেঞ্চ খনন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তেমনই কার্য্য-বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি। কোন গ্রামের ধনবান্ এক চৌধুরী বাড়ীতে শ্রাদ্ধের ভোজের আয়োজন হইতেছিল। বহু সহস্র লোকের আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হইবে, কিন্তু রান্নাঘরের এক কোণে মাত্র দুই তিনটি লোক বসিয়া রহিয়াছে। কর্ম্মচারী, কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিল—"লোকের অভাবে ভোজ পাকের কার্য্য ভালমত চলিতেছে না, এখন উপায় কি করি?" কর্ত্তা হুকুম দিলেন—"আজি আমার পিতামহের শ্রাদ্ধ; এ সময়ে এ কার্য্যে লোক নাই, এমন কথা আমি কিছুতেই শুনিতে পারি না। ভট্টাচার্য্য পাড়াতে যত ব্রাহ্মণ আছে, সকলকে ডাকিয়া আনিয়া এখনই রান্নাঘরে ঢুকাইয়া দাও।" জমিদারের আহ্বানে, যুবকগণের মধ্যে কেহ বা ইচ্ছায়

সহিত, কেহবা অনিচ্ছার সহিত আসিয়া শ্রাদ্ধ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ইহারা রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জলশূন্য মাটির বৃহৎ কলসী সকল শুষ্ক পড়িয়া রহিয়াছে; চুলাতে কাঠও জ্বলিতেছে না; মশলা পেশা হয় নাই; এমন কি, তরকারিগুলি পর্য্যন্তও কাটা হয় নাই। ব্রাহ্মণ যুবকগণ, কর্ম্মচারীকে এই সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিলে কর্ম্মচারী বলিলেন—"এই জন্যই তো আপনাদিগকে আনিয়াছি। বাজে কথাতে সময় নষ্ট করিবেন না, সমস্তই ঠিক ঠাক করিয়া লউন।" ব্রাহ্মণ যুবকগণ বলিলেন "কাজ করিতেই আমরা আসিয়াছি, কিন্তু এ সকল কাজ তো এজীবনে আমরা কখনও করি নাই।" কর্ম্মচারী উৎসাহ দিয়া বলিলেন—"এর জন্য চিন্তা কি? আমি তো উপস্থিত আছি, আমিই উপদেশ দিয়া দুই মিনিটের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া দিব,—আপনারা কাজে লাগিয়া যাউন।" তখন কেহ পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে যাইয়া কলসী ভাঙ্গিলেন, কেহবা তরকারী কাটিতে যাইয়া বঁটিতে আঙ্গুল কাটিয়া বসিলেন, কেহবা তপ্ত ঘৃতে পুরি ছাড়িতে যাইয়া হাত দগ্ধ করিলেন। ফল—সূর্য্যাস্ত হইল, তথাপি চৌধুরী বাড়ীর বিরাট ভোজের রন্ধন কার্য্য শেষ হইল না। এই ক্ষেত্রে যদি কার্য্যকর্ত্তা, জলবাহী কাহারকে জল তুলিতে, অন্তঃপুরের পরিচারিকাগণকে তরকারী কাটিতে এবং সুপকার ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া আনিয়া রন্ধন কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন এবং এই ব্রাহ্মণ যুবকগণকে পরিবেশন কার্য্যে ব্রতী করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এবং ব্রাহ্মণ যুবকগণকে এক্ষেত্রে এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। সংসারে এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েই ঘটিয়া থাকে। যথা-

যোগ্য ব্যক্তিকে তাহার অধিকারের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া বসাইতে পারিলে তবেই কার্য্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভবিতে পারে। নতুবা যাহাকে তাহাকে ধরিয়া যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে চৌধুরী বাড়ীর শ্রাদ্ধের অভিনয় করা হয় মাত্র। যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইয়া কেবল দৈহিক পরিশ্রমের কার্য্যে পটুতা দেখাইয়া যে শ্রেণীর সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জ্জনের সহায়তা করিতে হয়, সেই শ্রেণীর পদাতিক বা অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া এদেশের ব্রাহ্মণ-তনয়গণ, বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে কখনও যে সমর্থ হইবেন, এরূপ তো মনে হয় না। অথচ কর্ম্মপ্রার্থী উপস্থিত মাত্রেই যে তাহার অধিকার বিচার করিয়া, দেহগত শ্রমসাধ্য কার্য্য-বিভাগে স্থূলবুদ্ধি নিম্নশ্রেণীর লোকগণকে এবং মনঃশক্তির প্রতিভা বিকাশক কার্য্য-বিভাগে উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ যুবকগণকে প্রবিষ্ট করাইবার সুব্যবস্থা হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, এ কথা সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যালয়ের কর্ত্তারা এখনও ভালরূপে মনে স্থান দিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কর্ম্মপ্রার্থীর দৈর্ঘ্য এবং বুকের মাপ লওয়া ইত্যাদি কার্য্য লইয়াই সর্ব্বাগ্রে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু যদি সৈন্য সংগ্রহ-কার্য্যালয়ের দ্বারে যাইয়া দণ্ডায়মান হয়েন, তবে তাঁহাকেও তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ্য এবং বুকের পরিসরের পরিমাণ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরই সম্ভবতঃ সর্ব্বাগ্রে দিতে হইবে। তাঁহার আবিষ্কার-শক্তির পরিমাপ জানিবার জন্য হয় ত কেহ সেখানে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। সেই মান্ধাতার সময়ের প্রাচীন পদ্ধতিতে সৈন্য-

সংগ্রহের কার্য্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ এই ভাবেই কার্য্য হইতে থাকিবে।

বর্ত্তমান সময়ে সে কালের যুদ্ধের প্রকরণ পদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ সৈন্য সংগ্রহের নিয়মাবলী এখনও বিলাতে এবং এ:দেশে অনেকটা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। ইহারই ফলে যে শ্রেণীর সৈন্য সংগ্রহ হইলে এই বৈজ্ঞানিক যুগের যন্ত্রশক্তি-প্রধান যুদ্ধে বিজয় আয়ত্ব করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা হইতেছে না। জর্ম্মণ রাজ্যের সৈন্য সংগ্রহ বিভাগের এবং সৈন্য-শিক্ষাদান বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এসম্বন্ধে সময়ের গতির সহিত অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, জর্ম্মণ ও তুর্কী সৈন্য-শিক্ষা বিভাগে সাবেক প্রণালীর ড্রিল এবং কাওয়াজ শিক্ষা-দান একরূপ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে ইদানীং যাহাতে সৈন্যদের চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়গুলির বোধশক্তি বা অনুভব শক্তি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, ইহারই অনুকূল পদ্ধতিতে সৈন্যগণকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই জন্য সে সকল স্থানে সৈন্যগণকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিশেষরূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজেরাও জর্ম্মণের বিপুল জীবহত্যা প্রবর্ত্তক অনেক নূতন আবিষ্কৃত কলের এবং বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির ব্যবহার অনুসরণ করিতেছেন এবং জর্ম্মণেরাও ঐরূপ ইংরাজ ও ফরাসীজাতির আবিষ্কৃত ট্যাঙ্ক প্রভৃতি কোন কোন কলের ও যুদ্ধ-পদ্ধতির নকল করিয়া তাহারই সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে

চেষ্টা করিতেছেন। এমত স্থলে জর্ম্মণদের সৈন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির স্থল বিশেষের অনুসরণ করিয়া বরং তাহার আরও উন্নতি সাধন করিয়া বিজয়কে করায়ত্ব করিয়া লইতে বাধা কি? এই যে মাটি খুঁড়িয়া ট্রেঞ্চ প্রস্তুত করিয়া গর্ত্তে লুকাইয়া থাকিয়া যুদ্ধ করিবার অপূর্ব্ব প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া জর্ম্মণী যুদ্ধকে এরূপ দীর্ঘস্থায়ী করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, ইহাও জর্ম্মণীর নিজ আবিষ্কৃত নহে। তুর্কী বহুপূর্ব্বে এইরূপ মাটির দুর্গ প্রস্তুত করিয়া রুসের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। * জর্ম্মণী উহারই উন্নতি সাধন করিয়াছেন মাত্র। যে ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাপানী, বিশাল রাজশক্তি রুসিয়াকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া আজি পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শক্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, এই জাপানীরাও কিছুদিন

---

* রুস-তুর্ক যুদ্ধের সময় দানুব নদীর তীরে সংস্থিত তুর্কীদের অলতোনস্ত দুর্গ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে যখন বিশাল রুস সেনা-বাহিনী নদীর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত প্রায়, সেই সময় ওমরপাশা সাধারণ রীতিতে দুর্গের ভিতরে থাকিয়া দুর্গ রক্ষার চেষ্টা না করিয়া রাত্রে কতকগুলি সৈন্য লইয়া দুঃসাহসে ভর করিয়া দানুব নদী পার হইয়া আসিলেন এবং মাটি খুঁড়িয়া তাহারই ভিতর এক নূতন ছাউনি স্থাপন করিলেন এবং রুষ সৈন্যগণ তাঁহার ভূগর্ভ ছাউনির নিকট পৌঁছিবা মাত্র তিনি মাটির স্তূপের আশে পাশে হইতে অনবরত রুসদের উপর গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইভাবে এই স্থানে তিন দিন যুদ্ধের পর রুসেরা আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। রুস-তুর্ক যুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধকে ওমার পাশার কোদালের সাহায্যে অদ্ভুত যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে জর্ম্মণীর নিকটে যাইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থে বিনীত ছাত্রের আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব যুদ্ধ কার্য্যে শত্রু পক্ষের নিকট হইতেও তাহার কার্য্য-কলাপের সুপদ্ধতিগুলি গ্রহণ করিতে বাধা নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধে জর্ম্মণীর ভীষণ আক্রমণকে "বীরত্ব প্রধান" না বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে বরং "কৌশল প্রধান" আক্রমণ বলিয়া অভিহিত করিলে তাহাই বোধ হয় সমধিক সঙ্গত হইবে। দেহের আয়তনে দৈহিকবলে এবং সাহস সম্পদে রুস অপেক্ষা ইয়োরোপের অন্য কোন জাতির সৈন্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। অথচ এই যুদ্ধে এহেন রুসকে জর্ম্মণী যে ভাবে অপদস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাহাতে তাঁহাদের বীরত্ব অপেক্ষা বুদ্ধি-কৌশলের বা কুট বুদ্ধিরই অধিক প্রশংসা করিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রবীণ রাজনৈতিকগণও একথা অস্বীকার করেন না। জর্ম্মণ জাতি, যুদ্ধ ব্যাপারে এইরূপ বুদ্ধি কৌশলের লীলা প্রদর্শনের ক্ষমতা দুই চারি দশ বৎসর ব্যাপী শিক্ষাদ্বারা আয়ত্ব করিতে সমর্থ হয়েন নাই; তিন চারি পুরুষের মানব পরমায়ু পরিব্যাপক সুপদ্ধতি পরিচালিত ক্রমিক চেষ্টার ফলে জর্ম্মণ জাতি এই শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। তিন পুরুষের চেষ্টার পরে আজি সমগ্র জর্ম্মণ জাতি একটী অসাধারণ যোদ্ধার জাতিতে পরিগণিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছেন। যে প্রণালীর শিক্ষার ফলে জর্ম্মণ জাতিতে এইরূপ বিপুল অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহার প্রকৃতি পদ্ধতি লইয়া এখানে আলোচনা করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই, কারণ আমরা তাহা সম্যক্ অবগত নহি।

তবে আমরা একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে—যে প্রণালীর শিক্ষা দ্বারা এক শত বৎসর পূর্ব্বের ফরাসী বীর নেপোলিয়ানের পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত ও পরাজিত জর্ম্মণ জাতি, স্বীয় অঙ্গের "কাপুরুষ" বিশেষণ ধৌত করিয়া আজি পৃথিবী মধ্যে মহাযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত পন্থার শিক্ষা-পদ্ধতি সম্ভবতঃ এদেশে প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে। কারণ তাহা না হইলে, আমাদের এদেশে শত বৎসর পূর্ব্বেও যাঁহারা সাহসী বীর পুরুষ বলিয়া পূজিত হইতেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ আজি ভীরু কাপুরুষ নামে আখ্যাত হইবেন কেন?

ভারতবাসীকে যোদ্ধার পোষাকে সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নামাইতে ইচ্ছা করিলে তৎপূর্ব্বে ভারতবাসীর হৃদয়কে যোদ্ধার হৃদয়ে উন্নীত করিতেই হইবে। একটা জালিয়ার হাতের জাল টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বাহিক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া পাঁচ মিনিট মধ্যে তাহাকে সৈন্য সাজাইতে পারা যায় সত্য, এবং চেষ্টা করিলে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা যাইতে পারে ইহাও ঠিক, কিন্তু একটা ভীরু জালিয়ার হৃদয়কে সৎসাহসী যোদ্ধার হৃদয়ে পরিণত করিতে হইলে এবং তাহার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী যোদ্ধার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতে হইলে, তাহার সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী অনুরূপ সুব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃত যোদ্ধার মতন যোদ্ধা প্রস্তুত করিয়া পাঁচ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসময় নামাইতে হইলে কেবল তাহাদের শিক্ষাদানের সুব্যবস্থার জন্যই বহুকোটি টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে, এই কার্য্যে

বহু সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকেরও আবশ্যক হইবে। পরন্তু ভেড়াকে ঘোড়াতে রূপান্তরিত করিতে হইলে, ভীরুকে সাহসী প্রস্তুত করিতে হইলে, আর নির্ব্বোধকে বুদ্ধিমান্ যোদ্ধাতে পরিণত করিতে হইলে সময়েরও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনেরই প্রায় সমান অসদ্ভাব। এদিকে বন্যার জল বাড়ীর খিড়কীর দরজার ধাপের নিকটে আসিয়া উপস্থিত প্রায়; বাড়ী ঘর রক্ষা করিতে হইলে আর মুহূর্ত্তকালও ঘরে বসিয়া থাকা চলিবে না। এ সময়ে একমাত্র উপায় অবলম্বন দ্বারা এ অসুবিধা কতক পরিমাণে দূর করিতে পারা সম্ভবপর। তাহা এই—দুই বিভিন্ন শ্রেণী হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া দুই বিভাগে সৈন্য বিভক্ত করিয়া লইয়া তাহাদিগের দ্বারা যুদ্ধ ঘটিত বিভিন্ন ঐ দ্বিবিধ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করা। এই দ্বিবিধ কার্য্যের নাম—

(১) দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য।

(২) প্রতিভা-সাধ্য কার্য্য।

এইরূপ প্রথম হইতেই দুই শ্রেণীতে পৃথক্ করিয়া সৈন্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন কি, এমন প্রশ্ন যদি কাহারও মনে উদয় হয়, তবে তাঁহার কৌতূহল নিবারণার্থে একথার উত্তর এখানেই দিতেছি। ইয়োরোপে এখন যে প্রণালীতে সৈন্য প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহাকে সৈন্য প্রস্তুতের একটা অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কল বলিতে বাধা নাই। বন্য ঘোড়াকে, যেমন গাড়ীতে জুতিয়া অল্পদিনে তাহাকে "সায়েস্তা" করা হয়, সেইরূপ এই কলের ভিতরে উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত এবং উগ্র প্রকৃতির নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলিকে কিছু দিন চাপিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহাদিগকে আজ্ঞাবহ একরূপ যন্ত্র

বিশেষে পরিণত করিয়া উঠান যাইতে পারে। এই অদ্ভুত কলের যেমন এক দিকে এই অসাধারণ গুণ আছে, অন্যদিকে আবার তেমনি একটা দোষও আছে। এ কলের ভিতরে প্রতিভা সম্পন্ন মানুষকে আনিয়া ফেলিলে তাহার প্রতিভা ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। তাহার স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশক্ষেত্র পাইতে না পারিয়া ক্রমে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। এজন্য যাঁহাদের বুদ্ধির স্বাভাবিক তেজঃ আছে, তাঁহাদের সেই তেজঃ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া সেই সকল লোককে তাহাদের যোগ্যতার উপযুক্ত কার্য্য ভার দেওয়াই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হইলেই দ্বিবিধ আয়োজনে সৈন্য বিভাগের জন্য লোক সংগ্রহ এবং তাহাদের শিক্ষাপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিতেই হইবে। আমাদের একথাতে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, ব্রাহ্মণ মাত্রেরই জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিবার আমরা পক্ষপাতী। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা নিজ বর্ণোচিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলন কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রমজীবীর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন এবং নামে মাত্র ব্রাহ্মণ থাকিয়া বহু পুরুষ যাবৎ কেহবা বৈশ্যের, কেহবা শূদ্রের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহারা শ্রমসাধ্য সৈনিক কার্য্য অনায়াসেই নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য বিভাগের লোক, অথবা ড্রিল কাওয়াজাদি শিক্ষালাভের উপযুক্ত সৈন্য, দেশের নিম্ন শ্রেণীর বলবান্ লোকদের মধ্য হইতে প্রয়োজনানুরূপ বৃত্তি দিয়া সহজে সংগ্রহ করা চলিতে পারে। প্রতিভা বা বুদ্ধিবলসাধ্য কার্য্য বিভাগের লোক শিক্ষিত

উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতি হইতে সংগ্রহ হইতে পারে। কেবল বৃত্তিদানের বিনিময়ে এ শ্রেণীর লোক সংগ্রহ হওয়া সুকঠিন। কর্ত্তব্য বুদ্ধির উন্মেষণ করিয়া এ শ্রেণীর লোক সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। এ উভয়ের মধ্যে কেবল নামের পার্থক্য থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না; পরন্তু আসন, বসন, ভোজন, বাসস্থান এবং বৃত্তির পার্থক্য থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রথম শ্রেণীর সংখ্যার অনুপাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা কি পরিমাণ হওয়া আবশ্যক, তাহার বিচার, যুদ্ধ বিভাগের কর্ত্তারা কার্য্যক্ষেত্রের অবস্থা দৃষ্টে, সহজেই করিতে পারেন। অর্থাৎ কোন স্থানে দশ সহস্র প্রথম শ্রেণীর সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক হইতে পারে, সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈন্য দুই শতের অধিক পাঠাইবার প্রয়োজন না ও থাকিতে পারে, আবার স্থলবিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঁচশত লোক পাঠাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে, সেস্থলে তাহাদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর একশত লোক পাঠাইলেও হয়ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য বিভাগে নিযুক্ত সৈন্যের দ্বারা কিরূপ কার্য্যসকল সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথার আলোচনা এখানে আবশ্যক নাই; দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ প্রতিভা-সাধ্য কার্য্য-বিভাগে নিযুক্ত সৈন্য দ্বারা কিরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, অর্থাৎ যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন্ শ্রেণীর কার্য্যভার তাহাদের প্রতি অর্পিত থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করিব।

বর্ত্তমান যুদ্ধকে কেবল স্থল যুদ্ধ সংজ্ঞা মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে না; কারণ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এ যুদ্ধ সমান চলিতেছে। স্থল যুদ্ধের কার্য্যে যে সকল সৈন্য নিযুক্ত রহিয়াছে, স্থলবিশেষে তাহাদের দৈহিক বল বিক্রম দেখাইবার যেরূপ কথঞ্চিৎ সুবিধা আছে, জলের ভিতরে সবমেরিণে এবং আকাশে বায়ুযানে থাকিয়া যাহাদিগকে কার্য্য করিতে হইতেছে, তাহাদের পক্ষে তাহাও নাই। অসাধারণ সাহস এবং বুদ্ধি কৌশল অবলম্বন করিয়াই শেষোক্ত দ্বিবিধ যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যগণকে প্রায় সর্ব্বদাই কার্য্য করিতে হয়। এই দুই স্থানে প্রতিভার ক্রিয়া সহজেই অধিক পরিস্ফুট হইয়া থাকে; এজন্য যুদ্ধের এই দুই বিভাগেই বুদ্ধিমান্ সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সৈনিকে অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন।

স্থলযুদ্ধের মধ্যেও পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যকে যেরূপ অধিক দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, গোলন্দাজ বা Artillery বিভাগের সৈন্যগণকে সেরূপ করিতে হয় না। এখানেও অল্প শারীরিক শ্রম করিয়া কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধি চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারিবার সুবিধা আছে। এই বিভাগের কার্য্য আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) কামানাদির কল কারখানা ঘটিত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা বর্ষণ ঘটিত কার্য্য পরিচালন। এই দ্বিবিধ কার্য্যেই উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ভালরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। এই বিভাগের কার্য্যের উপযুক্ত উপাদান সামগ্রী সংগ্রহ ও প্রস্তুত করাও যুদ্ধের অঙ্গীয় আর একটা প্রধান কার্য্য বলিতে বাধা নাই। বারুদ, গোলা, গুলি, বোম, বিস্ফোরক চূর্ণ ও দাহ্য তরল বস্তু ইত্যাদি এবং বিষাক্ত

গ্যাস যে স্থানে প্রস্তুত হয়, সেস্থানে কেবল বিশ্বাসী নহে, অত্যন্ত সাবধান এবং সুচতুর লোককে নিযুক্ত রাখিবার প্রয়োজন হয়। উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণে এ গুরুদায়িত্বপূর্ণ বিভাগের কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের নক্সা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া স্থায়ী ও অস্থায়ী দুর্গ নির্ম্মাণ, নদী পার হইবার জন্য ক্ষণিক কার্য্যসাধনোপযোগী পুল প্রস্তুত করণ, পথ প্রস্তুত করণ, নিকট বা দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে খাল কাটিয়া সৈন্যের ছাউনিতে জল আনিবার সুব্যবস্থা প্রভৃতি যুদ্ধ সংক্রান্ত পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যে ঐ সকল হাতে কলমে অভিজ্ঞ কর্ম্মীর কেবল প্রয়োজন নহে, উহাতে প্রতিভাসম্পন্ন সুচতুর লোকেরও নিতান্ত আবশ্যক। এ দেশের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ সকল কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

যুদ্ধের রসদ সরবরাহ বিভাগ অর্থাৎ Commissariat Department সংক্রান্ত কার্য্য এদেশে বাহিরের লোক দ্বারা সম্পাদন হয়। জর্ম্মণীতে ইহাও সুশিক্ষিত সৈন্য দ্বারা গঠিত। এই বিভাগে এবং চিকিৎসা এবং হাঁসপাতাল সংক্রান্ত কার্য্যে এখনও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোক নিযুক্ত আছেন। এই সকল বিভাগের কার্য্যে আরও অধিক সংখ্যক সুশিক্ষিত এবং চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণ যুবককে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে।

যে দেশে যুদ্ধ হয় সেই দেশের জলবায়ু ঋতুর অবস্থা, নদ নদীর অবস্থা, সংক্ষেপে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ঘটিত জ্ঞাতব্য তত্ত্ব

পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ না হওয়ায়, অনেক সময়ে মহা ক্ষমতাবান্ যোদ্ধাকেও বিপদগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। মহাবীর নেপোলিয়ান রুষিয়া আক্রমণ করিতে যাইয়া মস্কো নগরে তুষারাবৃত হইয়া বিনা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং অতি কষ্টে জনকতক সঙ্গীমাত্র লইয়া গৃহে ফিরিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল নহে। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সৈন্যের দ্বারা এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধ ব্যাপারে প্রতিভার সহায়তা লইবার উপযোগী এতদ্ভিন্ন আরও অনেক শ্রেণীর কার্য্য আছে, তৎসমস্তের উল্লেখ করিতে হইলে প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে ; এ কারণ এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। সংক্ষেপে এই মাত্র এখানে বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধকার্য্যের যে যে বিভাগে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচালনার অধিক প্রয়োজন, এমন সমস্ত কার্য্যেই এদেশের প্রতিভাশালী উচ্চ বর্ণের লোকদিগকে নিযুক্ত করিলে যুদ্ধের ফল বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা যে অধিক পরিমাণে সন্তোষদায়ক হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

জর্ম্মণীতে শতাধিক বর্ষের Military Culture বা সামরিক অনুশীলনের ফলে এই শ্রেণীর কার্য্য সাধনোপযোগী মানুষ প্রস্তুত হইয়াছে। এদেশের বহু সহস্র বর্ষ ব্যাপী সমাজধর্ম্মগত এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মগত ধারাবাহিক অনুশীলনের ফলে পূর্ব্ব হইতেই এই শ্রেণীর কার্য্যসাধনোপযোগী লোক সকল প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছে। যুদ্ধকার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইবার উপযোগী ভস্মাচ্ছাদিত প্রতিভা বক্ষে

ধারণ করিয়া এ দেশের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ এখন কেহবা কেরাণীগিরি কার্য্য করিতেছেন, কেহবা কাপড়ের দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। যোগ্যতা বুঝিয়া ইঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ে এবং অতি অল্প চেষ্টাতেই কেবল কার্য্যসাধনোপযোগী নহে,—কার্য্যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম মহারথীরূপে ইঁহাদিগকে পরিণত করিয়া উঠান যাইতে পারে। এই দিকে চেষ্টা না করিয়া যদি এখন এই সকল মহামূল্যবান্ মাল মশল্লাকে লইয়া কেবল কতকগুলা সাধারণ পদাতিক সৈন্য প্রস্তুতকরণ কার্য্যে কালক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে হস্তে প্রাপ্ত বস্তুর পূর্ণ ব্যবহার করা যে হইতেছে না, ইহা বুঝিয়া আমাদিগকে এ সময়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেই হইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষে সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে আর একটা অতি প্রয়োজনীয় কথার দিকে আমাদের দেশের অনেক লোকের দৃষ্টি আজিও আকৃষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে না। তাহা এই,—সকলেই বলিতেছেন, "সৈন্য চাই, অতএব সৈন্য হও।" মোটামুটী দৃষ্টিতে "সৈন্য চাই" কথার উত্তরে সৈন্য হইবার জন্য কতকগুলি লোক উপস্থিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল মনে করা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে আক্রমণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সৈন্য এবং আত্ম রক্ষার জন্য সংগৃহীত সৈন্য দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্ সামগ্রী। কতকগুলি বলবান্ লোককে ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকে নামাইয়া দিয়া আক্রমণের সৈন্য প্রস্তুত করা চলিতে পারে; কিন্তু আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সৈন্য সম্পূর্ণ পৃথক্ উপাদানের দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে।

বিপুল হৃদয় বল লইয়া এবং মরিয়া হইয়া দাঁড়াইতে না পারিলে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সৈন্যের কার্য্যে নৈপুণ্য দেখাইবার সামর্থ্য লাভ করা যায় না। উচ্চ বেতনের আকর্ষণ এবং যশ ও উপাধির প্রলোভন দেখাইয়া অতি সহজেই প্রথম শ্রেণীর সৈন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু কেবল তীব্র কর্ত্তব্য জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে পারিলেই আত্মোৎসর্গী দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৈন্য সংগঠন করা সম্ভবপর হয়। নিজের দেশ বা ধর্ম্মরক্ষার চিন্তাকে অবলম্বন করিয়াই কেবল পূর্ব্বকথিত তীব্র কর্ত্তব্য বুদ্ধির বিকাশ দেখান যাইতে পারে। যাঁহারা হোমরুলের তবক দেওয়া বরফী দেখাইয়া, দেশের আবাল বৃদ্ধকে সৈন্য সাজিতে বলিতেছেন, তাঁহারা এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আজি যে রাজ-শক্তির হস্তে হোমরুল দেওয়ার অধিকার আছে, দুই দিন বাদে এ দেশের লোকে "হোমরুল উপভোগের যোগ্যতা দেখাইতে পারিলেন না" বলিয়াও ত তাহা পুনঃপ্রত্যাহার করিবার ক্ষমতাও সেই রাজশক্তির মুষ্টিমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধের কথা অন্যরূপ। মুসলমান রাজশাসন সময়ে ধর্ম্মরক্ষা ব্যাপার লইয়া এ দেশের হিন্দুগণকে কি কষ্টই না সহ্য করিতে হইয়াছে! এ সময়ে আমাদিগকে সে শ্রেণীর কষ্টভোগ করিতে হইতেছে না। ইংরাজগণ কোনরূপ আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিয়া আজি পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। জর্ম্মণ তুর্কী জাপানী ভবিষ্যতে কখন ইংরেজদের স্থলাভিষিক্ত হইলে তাঁহারা এ সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ করিতেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই। এদিক দিয়া

দেখিতে উপস্থিত হইলে অতীত কালের ব্যবহারের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট এ দেশের ব্রাহ্মণগণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। সেই কৃতজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধির উন্মেষণ হওয়া এ সময়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া,—স্বদেশ রক্ষা করিতে নহে, পরন্তু ইংরাজ জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য, কোন্ ব্রাহ্মণ এ সময়ে, তাঁহার দ্বারা যতটুকু কার্য্য হইতে পারে, তাহা করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন ?

এখন যুদ্ধের অবস্থা যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এ সময়ে এ দেশে শেষোক্ত শ্রেণীর যোদ্ধা সংগ্রহেরই সমধিক প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। এ সময়ে যাঁহারা লৌকিক প্রতিষ্ঠার ধূলি মুষ্টি দেখাইয়া এই ব্রাহ্মণ্য কর্ত্তব্যবুদ্ধির উচ্চস্থান হইতে বিচ্যুত করিয়া যুবকগণকে নীচে নামাইয়া আনিতে ব্যগ্র আর Conscription law বিধিবদ্ধ করাইয়া দেশের আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোককে ধরিয়া লইয়া যাইয়া কাওয়াজ শিক্ষার লাইনে দাঁড় করাইয়া করতালি দিতে ব্যাকুল, তাঁহারা ব্যবসায়িক বিদ্যা বুদ্ধিতে যত বড়ই হউন না কেন, বর্ত্তমান রাজনৈতিকক্ষেত্রে লোক-পরিচালক পদের গুরু দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে লইবার এককালীন অযোগ্য পাত্র।

এই শ্রেণীর দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য লোকেরা এ সময়ে আর একটা ভয়ঙ্কর ভ্রান্ত নীতির অনুসরণ করিতেছেন। ইঁহারা এই সুযোগে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ মধ্যে আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে, যে কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি এদেশে আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে,

তাহা তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। সৈন্যদলভুক্ত হইলেই ব্রাহ্মণযুবককে ডোম চামারের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতে কোন বাধা নাই, এইরূপ একটা কথা ইঁহারা এ সময়ে তুলিয়াছেন। ইঁহারা দেখিতেছেন না যে, ইহারই ফলে এদেশের অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সন্তানগণকে সেনাদলে প্রবিষ্ট হইতে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। এদেশের লোকের প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই লোকনীতিজ্ঞ লর্ড কিচ্‌নার, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, রাজপুত জাতির একদল, কনোজ ব্রাহ্মণের একদল, জাঠ জাতির একদল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৈন্যদল সংগঠনের ব্যবস্থা এদেশে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই নীতি অনুসরণ করিয়া মিলিটারি বিভাগের কর্তৃপক্ষ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সৈন্যের একটা স্বতন্ত্রদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যাঁহারা একাকারের আশঙ্কাতে পুত্র পৌত্রদিগকে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট করাইতে এখন অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের মন হইতে সে আশঙ্কা দূর করিতে এবং এই সহজ উপায়ে বহু ব্রাহ্মণ যুবককে সৈন্যদলে প্রবেশের সুযোগ দান করিতে পারিবেন।

এ সম্বন্ধে এ সময়ে আর একটা কথা না বলিয়াও নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। যেখানে ধর্ম্মরক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণযুবকের আত্মোৎসর্গ করা প্রয়োজন বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে, সেখানে তাঁহার চির-পোষিত ধর্ম্ম-মতকে শিথিল করিয়া দিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে বলাও যাহা, আর রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের বাষ্প বাহির করিয়া দিয়া, চালককে দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে আদেশ করাও তাহাই।

প্রস্তাবের উপসংহারে আর একটি কথার উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেছিনা। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ-কার্য্য চলিত, এখনকার যুদ্ধ-কার্য্য সেভাবে চলিতেছে না। এখন যেভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, শত বৎসর পরে আর সেভাবে যুদ্ধ-কার্য্য চলিবে না। মুসলমানের অভ্যুদয় কালে যুদ্ধাস্ত্র ছিল—তরওয়াল আর বর্শা; সে সময় লোকবলের প্রাধান্য দ্বারা যুদ্ধ-বিজয় হইতে দেখা যাইত। কিছুদিন পূর্ব্বেও অর্থবলে যুদ্ধ জয় হইতে দেখা গিয়াছে। এবার যন্ত্র-বলের উপরে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। বলিতে বাধা নাই—অতীতে পাশব বলের যুদ্ধ চলিত, বর্ত্তমানে দানব-বলের যুদ্ধ চলিতেছে, ভবিষ্যতে মানব বলের যুদ্ধ চলিবে। হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন, ময়দানব নামের সহিত কল-কৌশল-শিল্পকলার কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই জন্যই বর্ত্তমান কালের যুদ্ধকে "দানব-যুদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিতেছি। বর্ত্তমান যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পতিত হইলে অদূর ভবিষ্যতে আর এক নূতন ধরণের যুদ্ধ-ক্রীড়া আরম্ভ হইবে। সে যুদ্ধে এখনকার মত উত্তপ্ত নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হইবে না। কেবল মানবের প্রতিভা-বল সে মহাযুদ্ধক্ষেত্রের একমাত্র মহাস্ত্র থাকিবে। যে জাতির প্রতিভা অধিক থাকিবে, সেই জাতিই এই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জগতের আর সমস্ত জাতির উপরে অধ্যাত্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে। জগতের সেই ভাবী মহাযুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইবার উচ্চাভিলাষী এদেশের ব্রাহ্মণ-যুবক-যোদ্ধাগণ মধ্যে আজি কেহ আছেন কি? যদি কেহ থাকেন, তবে

ভবিষ্যতের সেই মহাযুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া, তাঁহার পক্ষে আজি এ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ভয়ের কথা কি? বর্ষা ঋতুতে দূর হইতে নিজের বাসস্থানে যাইয়া পৌছিতে হইলে, পরের জমির জল কাদা কাহাকেই বা না মাড়াইতে হয়?

—):o(—

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও সামরিক বিদ্যা।

(১)

সত্যপীরের ব্রতকথা কহিয়া নগদ দুই আনা পয়সা আর একখানা গামছা দক্ষিণা আদায় করিবার জন্য, ছেঁড়া একখানা পাঁচালী পুঁথি বগলে লইয়া ক্ষুধার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ঠাকুর বৈশাখের দুইপ্রহর রৌদ্রে কানু কেওটের বাড়ী অভিমুখে দ্রুতপদে ছুটিয়াছেন। এক দিকে ইদানীন্তন কালের ব্রাহ্মণ্য কর্ত্তব্য পালনের পদ্ধতি তো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অপর দিকে, ইয়োরোপের রণক্ষেত্রে, গভীর অন্ধকার রাত্রে, মাটির গর্ত্তের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া থাকিয়া দুইদল অসীম সাহসিক যোদ্ধা, এক অপরের অজ্ঞাতে, শত্রু পক্ষকে নষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ গোলা দুইহাতে শত্রুর ট্রেঞ্চ অভিমুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া সমরকৃতিত্ব দেখাইতেছেন। ইহার একটীর সহিত যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অতি দূর সংস্রব, তেমনি উহার অন্যটীর সহিতও প্রকৃত সামরিক বিদ্যার ততোধিক দূর সম্বন্ধ। এখানে "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম" এবং "সামরিক বিদ্যা" শব্দ উহার শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহার করা যাইতেছে; কাজেই ব্রাহ্মণ্য-পবিত্রতা

বিহীন আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত ব্রাহ্মণ অথবা সমর-শব্দ বাচ্য নহে অথচ যুদ্ধ নামধেয় আধুনিক হতাহতী ব্যাপার যে এ প্রস্তাবে আদৌ আমাদের লক্ষীভূত সামগ্রী নহে, ইহা পাঠককে প্রথমে জানিয়া রাখিতে হইবে।

বর্ত্তমান ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ এ প্রস্তাবের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে সত্য, কিন্তু এ সময়ে যে কারণে "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম" এবং "সামরিক বিদ্যার" কথা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলদেশে যে এই মহাযুদ্ধঘটিত ব্যাপারের একাংশ নিহিত রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের সমর-বল বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সৈনিকের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ত্রিশূলপত্রে ইতিপূর্ব্বে যে একটী প্রস্তাব প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে,—যুদ্ধ যখন ক্ষত্রিয়ের বর্ণ ধর্ম্মগত কার্য্য আর ব্রাহ্মণের বর্ণ-ধর্ম্মগত কার্য্য নহে, এমতাবস্থাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে যুদ্ধ ব্যাপারের কিরূপ স্থানে যাইয়া কোন্ পদ অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া সঙ্গত বা অসঙ্গত, এ সকল কথার আলোচনা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রক্ষণাভিলাষী ত্রিশূলপত্রে করা হয় কেন? এ কথার সংক্ষেপে উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণ, ইদানীং হীনদশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ যেমন অধ্যাত্মবিদ্যার সর্ব্বোপরি পথ প্রদর্শক এবং সর্ব্বোচ্চ উপদেশক, ব্রাহ্মণ তেমনই সামরিক বিদ্যারও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। সামরিক বিদ্যার অধ্যয়ন অধ্যাপনা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বহির্ভূত সামগ্রী নহে। ধর্ম্মরক্ষার্থে ধর্ম্ম-যুদ্ধের

প্রবর্ত্তনা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত একটা কার্য্য। পুরাণ তন্ত্রের নির্দ্দেশ তথা শ্রুতিস্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ, এই সিদ্ধান্তকে কতদূর সমর্থন করে, তাহাই দেখাইবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা।

প্রথমেই এইরূপ একটা খট্‌কা উপস্থিত হইতে পারে যে,—ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যখন ব্রাহ্মণের একমাত্র পরমাকাঙ্ক্ষিত বিষয়, এতদ্ভিন্ন এই নশ্বর পৃথিবীর আর সমস্তই যখন তাঁহার চক্ষে নিতান্তই অসার সামগ্রী, তখন মারামারী কাটাকাটী ব্যাপারের মধ্যে ব্রাহ্মণের চিত্তবৃত্তি কোন কারণেই আকৃষ্ট হইবার কথা নহে। এ কথা ঠিক; কিন্তু যেখানে পরবিত্ত আয়ত্ত করাই হইতেছে বিবাদের মূলীভূত কারণ, সেইরূপ ক্ষেত্রের জন্যই ঐ কথা। যেখানে তাহা নহে অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণের ইপ্সিত পরমজ্ঞান লাভের পথে বাধা বিঘ্ন অপসারণের জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন, ব্রাহ্মণের আত্মধর্ম্ম রক্ষার জন্য যেখানে ব্রাহ্মণকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিবার আবশ্যক, সেখানকার জন্য এ নীতি প্রয়োজ্য নহে। ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মজ্ঞানার্জ্জনের জন্য প্রথমে তাঁহার নিজের চিত্তকে পবিত্র করিতে হয়; চিত্ত পবিত্র ও প্রকৃতিস্থ না থাকিলে, শরীর ও বুদ্ধি-বৃত্তি কার্য্যসাধনোপযোগী থাকিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে (গরুড় পুরাণে) বলিয়াছেন—

"চিত্তায়ত্তং ধাতুবশ্যং শরীরং, চিত্তে নষ্টে ধাতবোযান্তি নাশম্।
তস্মাচ্চিত্তং সর্ব্বদা রক্ষণীয়ং, স্বস্থে চিত্তে, বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি॥"

চিত্তকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিতে হইলে সতত যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন। ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যের উপকরণ সামগ্রীর মধ্যে আপনার দেহটীকেই সর্ব্বপ্রধান বস্তু বলিতে হয়। দেহ না

থাকিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে কাহার বলে? এজন্য দেহ রক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এজন্যই শাস্ত্র কর্ত্তারা সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন,—

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"

আরও বলিয়াছেন—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"

দেহ ধারণের জন্য অন্ন বস্ত্রাদি সংস্থানেরও প্রয়োজন; সেজন্য একটা বাসস্থানেরও প্রয়োজন;—অর্থাৎ শান্তিতে থাকিয়া জ্ঞানানু-শীলন করা যাইতে পারে, এমন নিরাপদ বাসস্থানেরও তাঁহার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম অনুশীলন কার্য্যে আত্মনিয়োগের পূর্ব্বে শিক্ষা প্রাপ্তির সুব্যবস্থারও নিতান্ত প্রয়োজন। এক জীবনের অনুশীলনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে; এজন্য নিজ জীবধারা বা বংশ-প্রবাহ রক্ষার প্রয়োজন, অর্থাৎ নিজের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদিতে আসিয়া ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতে পারেন, এরূপ নিজ বংশধারা-প্রবাহ রক্ষার সুব্যবস্থা করাও তাঁহার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। * এজন্য স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ পবিত্রভাবে রক্ষা করি-বার প্রয়োজনও ব্রাহ্মণে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে মানব-সমাজ-ধর্ম্ম মধ্য দিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের বিভিন্ন স্তর বা সোপান অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্তিমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে হয়। কাজেই কেবল নিজের জীবন নহে, মানব-সমাজকে পবিত্রভাবে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদাই বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়।

* "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" মনুঃ স্মৃতি।

এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। নিজের ক্ষুদ্র বাড়ীখানিকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করিতে হইলে যেমন প্রতিবেশীদের বাড়ী-ঘর এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিবার প্রয়োজন, সেইরূপ নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে নিজ সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিবারও একান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিত্তি এই উচ্চ নীতির উপরে সংস্থিত।

চোর, তস্কর, দস্যুদল তথা দস্যুভাবাপন্ন রাজশক্তি—তাহা ভিন্ন দেশেরই হউক বা নিজ দেশেরই হউক—যাহাতে নিজের পবিত্র সমাজকে আক্রমণ করিয়া সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়া তুলিতে না পারে, এজন্য ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদাই সচেতন থাকিতে হয়। প্রাচীন-কালে এদেশের ব্রাহ্মণগণের এই দায়িত্ববোধ পূর্ণমাত্রাতে ছিল বলিয়াই দৈত্য ও অসুরদের আক্রমণ হইতে সমাজ ও দেশ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সময় সময় যাইয়া ক্ষত্রিয় বীরপুরুষদের এবং দেবতাদের শরণাপন্ন হইতেন। কেবল তাঁহারা তাহাই করিতেন না, নিজেরা অতি যত্নের সহিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন এবং নিজের অধীত সামরিক বিদ্যা যোগ্য ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণকে শিক্ষা দিতেন এবং বিশেষ প্রয়োজন স্থলে তাঁহারা স্বয়ং সমরক্ষেত্রে যাইয়া অবতীর্ণ হইতেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাম লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র ও অগস্ত্যঋষি, কৌরব ও পাণ্ডবগণকে দ্রোণাচার্য্য, লব-কুশকে বাল্মীকি ঋষি, ভীষ্মকে ও কর্ণকে পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে দত্তাত্রেয়, কৃষ্ণ বলরামকে সন্দীপন ঋষি, দানবগণকে শুক্রাচার্য্য এবং দেবগণকে বৃহস্পতি অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। পুরাণ

ইতিহাসাদি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ আরও কতশত রাজার এবং তাঁহাদের সমর বিদ্যা-শিক্ষাপ্রদাতা মহাপ্রতাপশালী ব্রাহ্মণ-গুরুদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ এদেশের প্রাচীনকালে সমর বিদ্যার প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপদেষ্টা ঋষিগণই ছিলেন। ঋষিগণই সমরবিদ্যার রক্ষক ছিলেন। ধনুর্ব্বেদসংহিতা ঋষিরই কণ্ঠনিঃসৃত উক্তি সকল হইতে সঙ্কলিত।

পুরাকালে ব্রাহ্মণ যোদ্ধাগণ যে কেবল ক্ষত্রিয় রাজকুমারগণকে সমর বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, তাহা নহে; তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে স্বয়ংও সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধকার্য্যে নেতৃত্ব করিতেন। ইতিপূর্ব্বেও একবার একথার আভাস দিয়াছি। স্থল বিশেষে যুদ্ধ-কার্য্যে ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ের সহযোগিতা করিলেও, রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্ব এবং ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ পৃথক প্রকারের ছিল। এতদুভয়ের মধ্যে হিমালয় এবং বল্মীকস্তূপের পার্থক্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুরাণ ইতিহাসাদির নিপুণ পাঠকগণের নিকটে এই পার্থক্যের পরিচয় দানের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। অন্যকে বুঝাইবার জন্য সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করিতেন, ব্রাহ্মণগণ তাহা করিতেন না; তাঁহারা সাধারণতঃ আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন স্থলে অস্ত্র ধারণ করিতেন। ইহার অন্যথাচরণ করিয়া যেখানে যেকোন ব্রাহ্মণ, বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চিন্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তিনি দশের চক্ষে অতিশয় লঘু হইয়া পড়িতেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য মহাপরাক্রমশালী অদ্বিতীয়

যোদ্ধা হইয়াও কুরু-বৃত্তিভোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন আর রাজ্যাধিকারেচ্ছা-পরিশূন্য ব্রাহ্মণ পরশুরাম বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলিয়া হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র আজিও প্রপূজিত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এক অতি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই আচরণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইহা এখানে আর একটু বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি।

ধনুর্ব্বেদের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ, ব্রাহ্মণ্য-অনুশীলনের আর একটা বিশাল বিভাগ। চরক, সুশ্রুত, হারীত, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ-প্রণেতাগণ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। অথচ ব্রাহ্মণ, চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইলে যে সমাজের চক্ষে হেয় হইয়া পড়েন, তাহা আজিও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করা যে একটা অতিশয় পাপ জনক কার্য্য, শাস্ত্রেও একথা উক্ত হইয়াছে। * দেবতার পূজা, আরাধনা এবং হোম যজ্ঞাদি করা ব্রাহ্মণের অতি প্রিয়কার্য্য, কিন্তু বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিলেও ব্রাহ্মণ আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী পাপী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। † অন্য কথা দূরে থাকুক, যে অধ্যয়ন

---

* শ্রাদ্ধে ও যাগযজ্ঞে চিকিৎসক ব্রাহ্মণের বর্জ্জন করিতে হইবে। যথা—

"চিকিৎসকান্দেবলকান্মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃস্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥" মনুসংহিতা।

† "শূদ্রশস্ত্রোচ্ছিত্তযাজী গ্রামযাজীতি কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপজীবজীবীচ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অধ্যাপনাদি করা ব্রাহ্মণ-জীবনের প্রধান কার্য্য, তাহাও বৃত্তি গ্রহণ করিয়া করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবেন বলিয়া শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে।* শাস্ত্রের এই সকল বিধি ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, অর্থ গ্রহণ করিয়া অর্থের বিনিময়ে ব্রাহ্মণ চিকিৎসা কার্য্যেই লিপ্ত হউন বা যুদ্ধ কার্য্যেই নিযুক্ত হউন, অথবা বিদ্যাশিক্ষা দান করুন কিম্বা যাগযজ্ঞ দেবপূজাদি কার্য্যেই ব্রতী হউন, তাহাতে ব্রাহ্মণের জীবনে ক্রমে কতকটা দোকানদারী বা বৈশ্য ভাবের প্রাদুর্ভাব করিয়া তাঁহার "ব্রাহ্মণ্যপবিত্রতা" এককালীন নষ্ট করিয়া দিতে পারে বলিয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে এই সকল আচরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা কেনই যে বলিয়াছেন—

"শূদ্রাণাং স্থপকারীচ শূদ্রযাজীচ যে দ্বিজঃ।
অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ॥"

শূদ্রপাকোপজীবী যঃ স্থপকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়ান্তিতে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

"কুশীলবো দেবলকো নক্ষত্রৈর্যশ্চজীবতি।
ঈদৃশা ব্রাহ্মণা যে চ অপাংক্তেয়াস্তুতে মতাঃ॥"

পদ্মপুরাণ।

* "গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়মৃণানাঞ্চ পরিক্রিয়া।
অনাহিতাগ্নিতা পণ্যবিক্রয়ঃপরিবেদম্॥
ভৃতাদধ্যয়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনং তথা।
পারদার্য্যং পরিবিত্তাং বার্দ্ধষ্যং লবণক্রিয়া॥

ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে অতঃপর কাহাকেই আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না।

ইদানীন্তন কালের একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমাদের শাস্ত্রের এই সুদূরদর্শী সিদ্ধান্তের

স্ত্রীশূদ্রবিট ক্ষত্রবধো নিন্দিতোর্থ জীবিতা।
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মূলংগোশ্চৈব বিক্রয়ঃ॥
পিতৃ মাতৃ সুহৃত্ত্যাগস্তড়াগারাম বিক্রয়ঃ।
কন্যায়াদূষণঞ্চৈব পরিবিন্দক যাজনম্॥
কন্যাপ্রদানং তস্যৈব কৌটিল্যং ব্রতলোপনম্।
আত্মনোঽর্থে ক্রিয়ারম্ভো মদ্যপস্ত্রীনিষেবনম্॥
স্বাধ্যায়াগ্নিসুতত্যাগো বান্ধবত্যাগ এবচ।
অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং ভার্য্যাত্মপরিবিক্রয়ঃ॥
উপপাপানি চোক্তানি প্রায়শ্চিত্তং নিবোধত॥"

গরুড়পুরাণ।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই:—গোবধ, উপনয়নাদি সংস্কারহীনতা, চুরি, ঋণ পরিশোধ না করা, নিত্য হোমাদি না করা, পণ্য বিক্রয়, পরিবেদন, বেতন দিয়া অধ্যয়ন ও বেতন লইয়া অধ্যাপন, পরদার, পরিবিত্তিতা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ, সুদ গ্রহণ, লবণ বিক্রয়, স্ত্রীশূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় বধ, নিন্দিত উপজীবিকা, নাস্তিকতা, ব্রতভঙ্গ, অভিচারাদি কার্য্য, গোবিক্রয়, পিতামাতা ও বন্ধুগণকে ত্যাগ, সরোবর ও উদ্যান বিক্রয়, কন্যা দূষণ, পরিবিন্দক-যাজন বা তাহাকে কন্যাদান, কুটিলতা, ব্রতলোপ, আপনার প্রীত্যর্থ কোন কার্য্যানুষ্ঠান, মদ্যপান, পরস্ত্রীসেবা, স্বাধ্যায়, অগ্নি সুত ও বান্ধবত্যাগ, অসৎ শাস্ত্রপাঠ, ভার্য্যা ও পুত্র বিক্রয় এই সকল পাপকার্য্য উপপাতক মধ্যে পরিগণিত এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ।

মূলে যে কি অটল সত্য নিহত রহিয়াছে, তাহা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে।

মুসলমান রাজ্য শাসন সময়ের মধ্যভাগে যখন হিন্দুসমাজের উপর অত্যাচারের মাত্রা অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন ক্ষত্রিয়গণ এককালীন হীনতেজঃ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কতকগুলি বলবান্ লোকের অস্ত্রধারণ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণোচিত যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রধারী যোদ্ধারূপে আপনাদিগকে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার এবং গ্রামবাসিগণ কিছু কিছু ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা হিন্দু সমাজ তৎকালে বিশেষরূপে উপকৃত হইতে থাকিলেও ইঁহারা যে নগদ বেতনের নামান্তর শস্যক্ষেত্রের উপসত্ব ভোগ করিয়া এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া রহিয়াছিলেন, এজন্য তৎসাময়িক ব্রাহ্মণ সমাজে ইঁহারা একটু হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের সন্তান সন্ততিগণ সেই অবধি ব্রাহ্মণ সমাজে একটু হীনভাবাপন্নই হইয়া রহিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালাতে বিহারে ও কাশী-প্রয়াগ প্রদেশে "ভুঞার ব্রাহ্মণ" নামে আজি যে সম্প্রদায় অভিহিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের কথা এখানে বলিতেছি। এই "ভুঞার ব্রাহ্মণকে" যাঁহারা মাগধ, মাথুর ও নাগর ব্রাহ্মণের ন্যায় একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ মনে করেন এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের মূল দৃঢ় করিবার জন্য

যাঁহারা ইঁহাদের সৃষ্টি বৃত্তান্ত আবিষ্কার উদ্দেশ্যে পুরাণের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত * দিল্লী হইতে মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত যমুনা ও গঙ্গার উভয় কূলের কতকদূর পর্য্যন্ত,—

* "Bábhans, or, as they are called, Bhúinhár or *zamíndári* Bráhmans, are numerous in this District, and particularly so on the north of the Ganges, where, in the Begu Sarái Subdivision they are twice as numerous as the whole Musalmán community, and form a fifth part of the entire population. The Rájá of Bettia and several of the large *zamíndárs* of Behar are Bábhans. Although the wealthier and more educated persist in their claim to a pure Bráhmam descent, the humbler members of the order acknowledge their inferiority and themselves repeat the story that when Karna Rájá drove out the Bráhmans, he raised some of the lower castes to the priesthood, and that they are the descendants of the improvised priests. The Bráhmans represent those castes to have been the lowest of the low, such as fishermen, Kaibarttas or Patuás. The evident exaggeration in this theory defeats the object the Bráhamans have in view, as most Súdrás and all the lower castes are of aboriginal descent, while the Bábhans are a fine race, with clearly marked Aryan features. It appears from the Census Report of 1872, that they are to be found in the greatest number in trans-Gangetice-Monghyr and the part of Tirbut adjoining it, In Behar they pretend to be Sarwariyá Brahmans and apparently in some parts of the North-West they make a similar pretence. Dr. Buchanan Hamilton makes them Sakadwipis."

(Statistical Account of Bengal VOL. XV.)

যেখানে পূর্ব্বকালে মুসলমানদের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, কেবল সেই সকল স্থানেই "ভূঞার ব্রাহ্মণের" অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানেই কতকগুলি বলবান্ ব্রাহ্মণ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও দেবালয়াদি রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং কতকটা ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন যোদ্ধারূপে আপনাদিগকে পরিণত করিয়াছিলেন। ইঁহারা নিজ জীবনে এবং তৎপরে পুরুষানুক্রমে গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত ভূমির উপসত্ব দ্বারা আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই ইহাঁরা সমাজের চক্ষে অদ্যাপি হীন ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। বৃত্তি না লইয়া যদি ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল ব্রাহ্মণ্য কর্ত্তব্য পালনার্থ যোদ্ধা সাজিয়া ধর্ম্মরক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সমাজে ইহাঁদেরই সম্মান অধিক হইত এবং ইহাঁরা সমাজের অতি উচ্চ ও পূজ্য আসন অধিকার করিয়া রাখিতে পারিতেন।

ব্রাহ্মণগণ যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখনই তাহাতে অসীম পারদর্শিতা দেখাইতে পারিয়াছেন। যে সকল বীর ব্রাহ্মণ, মুসলমান রাজ্যশাসন সময়ে নিম্নশ্রেণীর দুর্দ্দান্ত মুসলমান রাজপুরুষগণের অত্যাচার হইতে হিন্দু দেবালয় ও হিন্দুরমণীগণকে রক্ষা করিবার জন্য—কতকটা ইয়োরোপের মধ্যযুগের "নাইট" শ্রেণীর ন্যায়—রক্ষক নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরগণ এক সময়ে এতদূর শক্তিশালী যোদ্ধা হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ভয়ে মুসলমান রাজ্যশাসকগণকে পর্য্যন্ত চিন্তাকুলহইতে

হইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, মুসলমান রাজ্যশাসন কালের মধ্যে এক সময়ে বাঙ্গালা দেশকে বারভাগে বিভক্ত করিয়া বারজন হিন্দুরাজা সম্পূর্ণ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "বার ভূঞা" বলিয়া ইঁহারাই বাঙ্গালার ইতিহাসে অদ্যাপি পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিহার এবং কাশী-প্রয়াগ প্রদেশে "ভূঞার" ব্রাহ্মণের হস্তে এখনও কতকগুলি সুবৃহৎ জমীদারীর শাসন সংরক্ষণ কার্য্য ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে কেহবা অর্দ্ধ স্বাধীন কেহবা সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এখন ইঁহারা "জমিদার" নামেই খ্যাত। এই সকল ব্রাহ্মণ জমিদার, বিত্ত বিভব ঐশ্বর্য্যে ও রাজসম্মানে এ সময়ে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকা সত্ত্বেও, যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম্মাচরণ হইতে কতকটা স্খলিত বলিয়া, ইঁহারা হিন্দুসমাজের চক্ষে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণী অপেক্ষা সামাজিক সম্মানে অনেক দূর নিম্ন স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন।

এসম্বন্ধে কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন যে,—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি ত্যাগ করাতে ইঁহারা সমাজের চক্ষে লঘু ভাবাপন্ন হয়েন নাই, পরন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবহত্যা নিষেধ, সে স্থলে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যুদ্ধবিগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া নরহত্যা মহাপাপে জড়িত হইয়া পড়িবার সময় হইতেই হেয় হইয়াছিলেন এবং সেই হইতে ইঁহাদের বংশধরগণ সমাজের দৃষ্টিতে হীন ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রমাত্মক। যে ধর্ম্মশাস্ত্রে অতি

ক্ষুদ্র জীব মুষিক মার্জ্জার ভেকাদি পর্য্যন্ত হত্যাতে, হত্যাকারী ব্রাহ্মণকে, ঐরূপ হত্যাজনিত পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে, আদেশ করিয়াছেন, * সেই ধর্ম্মাশাস্ত্রেই মুক্তকণ্ঠে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন যে,—আক্রমণকারী শত্রু বা আততায়ী-বধে কিছুমাত্র পাপ নাই।† ঐরূপ আততায়ী শত্রু যদ্যপি ব্রাহ্মণ হয়, তবে সেরূপ ব্রাহ্মণ শত্রুকে বধ করিতেও পাপ নাই।‡ কেবল ইহাই

* মুষকমার্জ্জারনকুলমণ্ডুকডুণ্ডুভাজগরানামন্যক্রমমুপোষিতঃ।
কৃতরান্ন ভোজয়িত্বা লোদণ্ডং দক্ষিণাং দদ্যাৎ।"

বিষ্ণুসংহিতা।

"ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে।
মিত্রাদিষু সমোমৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু॥
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃ কর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসংজ্ঞাশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

† গীতার টীকাতে শঙ্কর স্বামী লিখিয়াছেন—
"নাততায়ীবধে দোষা হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥"

‡ "নাততায়িবধে হন্তা প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎবং ক্বচিৎ।
বিনাশার্থিনমায়ান্তং ঘাতয়ন্নাপরাধ্নুয়াৎ॥
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥"

মনু স্মৃতি।

"আত্মানং হন্তুমায়ান্তমপি বেদান্তপারগং।
ন দোষো হননে তস্য ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ॥

নহে, পুরাণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেশের রাজা—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সম্মান করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে,—এহেন রাজা, দুষ্টাচারী ও কুকর্ম্মান্বিত হইলে এবং সমাজের অনিষ্টাচরণ করিলে, ব্রাহ্মণগণ নিজেই সেরূপ রাজাকে কখনও বা সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছেন, কখনও বা সেরূপ রাজাকে ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন।* আধুনিক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত অর্থাৎ বৌদ্ধ, জৈন

প্রায়শ্চিত্তং হিংসকানাং ন বেদেষু নিরূপিতং
বধে সমুচিতে তেষামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ" ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

"আততায়ীর"র অর্থ স্মৃতিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—
"অগ্নিদোগরদশ্চৈব শাস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥"

বশিষ্ঠ-স্মৃতি।

"উদ্যতাসি বিষাগ্নিঞ্চ শাপোদ্যত করং তথা।
আথর্ব্বণেন হন্তারং পিশুনঞ্চৈব রাজসু ॥
ভার্য্যাতিক্রামিণঞ্চৈব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িনঃ।"

বিষ্ণুপুরাণ।

* এক সময়ে বেণ নামক কোন হিন্দু নৃপতি বড়ই অত্যাচারী ও অধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। যথা—

"ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোঽপি স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥

বা বৈরাগী গোঁসাই ঠাকুরদের কতকগুলি উপদেশ বাক্য, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাচরণ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইদানীং কিছুকাল যাবৎ উহার প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে সত্য, কিন্তু শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ তন্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থার কোন স্থানেই আত্মরক্ষার জন্য, প্রয়োজন স্থলে, ব্রাহ্মণকে, নরহত্যা করিতে নিবারণ করে না, বরং উহা না করাই পাপ বলিয়া ঘোষণা করে।

ফলতঃ হিন্দুসমাজের চিরাগত লোক-ব্যবহার তথা শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা এতদুভয়েই একবাক্যে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে যে,—এদেশে ব্রাহ্মণগণ, প্রয়োজনস্থলে, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কোন কালেই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তবে অতি পূর্ব্বকালে অর্থ সম্পর্ক-শূন্য হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল লোক-হিতার্থে এবং সমাজ-ধর্ম্মরক্ষার্থে তাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হইতে পারিতেন, পরন্তু ব্রাহ্মণের অবস্থা কালচক্রের নিম্নগতির সহিত যতই হীন হইতে হীনতর দশাতে আসিয়া নামিয়া পড়িতেছে, ততই ব্যক্তিগত লাভের দিকে চক্ষু রাখিয়া তাঁহারা যুদ্ধাদি সকল কার্য্যে প্রবেশ করিতেছেন।

ততস্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে কোপমর্ষসমন্বিতাঃ।
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইত্যূচুস্তে পরস্পরম্॥
যো যজ্ঞপুরুষং দেবং অনাদি নিধনং প্রভুম্।
বিনিন্দত্যধমাচারো ন স যোগ্যোভুবঃ পতিঃ॥
ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপূতৈস্তৈঃ কুশৈর্মুনিগণা নৃপম।
নিজঘ্নুর্নিহতং পূর্ব্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

বর্ত্তমান সময়ের যুগান্তর আনয়নকারী বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে যদি তাঁহারা অর্থলাভ চিন্তার দিকে কিছুমাত্র চিত্ত না দিয়া কেবল নিজধর্ম্ম রক্ষার দিকে চক্ষু রাখিয়া, উপকারক ইংরাজকে উপস্থিত বিপদ হইতে ত্রাণ করিবার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তবে, এইরূপ আচরণ দ্বারা তাঁহারা যে কেবল নির্ব্বাণ প্রায় ব্রাহ্মণ্যকর্ত্তব্যবুদ্ধি পুনঃ প্রজ্বলিত করিবেন তাহাই নহে, উহা দ্বারা তাঁহারা দেশ ও জাতিগত লুপ্ত গৌরবও পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।

(২)

ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে যেমন সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী বর্ণমালার এ, বি, সি, ডি অক্ষরগুলি আয়ত্ত করিতে হয়, ইয়োরোপীয় সমরবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে সেইরূপ সৈনিককে সর্ব্বাগ্রে ড্রিল বা কাওয়াজ অভ্যাস করিতে হয়। আমাদের এ দেশে প্রাচীন কালে সমরবিদ্যা শিক্ষার্থীকে এ ভাবে হস্ত পদের সম্প্রসারণ সমাকুঞ্চন বা ড্রিল অভ্যাস কার্য্যে সময়ক্ষেপ করিতে হইত না, পরন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত দেহ ও মনকে সুদৃঢ় সুপটু ও কষ্টসহিষ্ণু করিবার জন্য কঠোর তপশ্চরণ অভ্যাস করিতে হইত।

কলের ছাঁচের এক ঢালাই শিক্ষানীতির প্রভাব ইয়োরোপে ইদানীং এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, এদেশের ইউনিভারসিটির এম এ, বি এ, পরীক্ষাদিতে যেমন মুদ্রিত প্রশ্ন দিয়া লিখিত উত্তর লইয়া পরীক্ষার্থিগণকে পাশ ফেল করা হইয়া থাকে, সেইরূপ বিলাতেও উলউইচ প্রভৃতি যুদ্ধ শিক্ষার কালেজ স্কুলেও, এমনকি ড্রিল বা কাওয়াজ সম্বন্ধেও, বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে লিখিত প্রশ্নের

লিখিত উত্তর লইয়া সৈনিক পুরুষগণের যোগ্যাযোগ্যতা স্থির করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এদেশের গভর্ণমেণ্টের আফিস সমূহে আমরা যেমন নিত্য নানা বিষয়ের রিপোর্ট এবং মুদ্রিত ফারম "পূর্ণ" করিবার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই, বিলাতের সৈন্যশিক্ষা বিদ্যালয় গুলিতেও উহার ব্যবহার ইদানীং প্রায় তদ্রূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের প্রাচীনকালে, সমরবিদ্যা শিক্ষাদান ব্যাপারে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিখিত প্রশ্নপত্রের লিখিত উত্তর গ্রহণ দ্বারা পরীক্ষায় পাশ ফেইল করা কিম্বা ঐরূপ রিপোর্ট এবং ফারম পূর্ণ করিবার কোনরূপ প্রথা যে আদৌ ছিল না, ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। সামরিক বিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষা এদেশে অন্য পদ্ধতিতে গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল। শিক্ষার শেষে প্রকাশ্য রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া রাজকুমারেরা সহস্র সহস্র দর্শকের সমক্ষে স্ব স্ব সামরিক যোগ্যাযোগ্যতার পরীক্ষা প্রদান করিতেন এবং জনসাধারণের কণ্ঠ হইতে পরীক্ষার পাশ ফেলের ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিতেন। *

সেকালে এই ভাবে সমর বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইত বলিয়াই রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকেই গুরুগৃহে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ রামায়ণ মহাভারত ও নানা পুরাণে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল রাজকুমার নিজ গৃহে অবস্থিতি

* যাঁহারা ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৩৪ এবং ১৩৫ অধ্যায় দেখিবেন।

করিয়া পিতার নিকট হইতে সমরবিদ্যা শিক্ষা করিতেন, তাঁহা-দিগকেও নিজ গৃহেই ব্রহ্মচারীবৎ থাকিতে হইত।*

ইংলণ্ডের সমরশিক্ষা পদ্ধতিতে ইহার কতকটা বিপরীত ভাব আমরা দেখিতে পাই। বিলাতের ধনীগৃহের অনেক যুবা পুরুষ, সমরবিদ্যা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজশ্রমসাধ্য ও সুখকর কার্য্য জ্ঞানে, তথাকার সুপ্রসিদ্ধ Sandhurst অথবা Woolwich সমর বিদ্যালয়ে যাইয়া প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই সকল সময় বিদ্যালয়ে অবস্থিতি সময়ে, ছাত্রগণ মধ্যে অনেকেই বিলাস-ব্যাসন এবং অতি মাত্রায় আমোদ উৎসব উপভোগ করিতে করিতে এতই বিকৃত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা প্রায় সৈনিক পরিচালক পদে উন্নত হইয়াও অমিতব্যয়িতাদি নানা চরিত্রদোষে আক্রান্ত হইয়া নানারূপ কষ্ট ও গ্লানি ভোগ করিতে বাধ্য হয়েন। বাজী রাখিয়া তাস খেলায় খেয়ালে পানাসক্তিতে তথা অবৈধ বিলাস ব্যসনে বিজড়িত হইয়া বিলাতের কত সৈনিক পুরুষের কর্ম্মময় জীবন উন্নতির মধ্যপথে অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিলাতে এরূপ ঘটনা কতই সাধারণ!

* কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সূর্য্যবংশীয় কুমার রঘু তাঁহার পিতা মহারাজ দিলীপের নিকট যে সময়ে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন মুনিপুত্রদের ন্যায় মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া থাকিতেন এবং অতি সামান্য অথচ পবিত্র ভাবে দিন যাপন করিতেন। যথা—

"ত্বচংসমেধ্যপরিধায় রৌরবীমশিক্ষতাস্ত্রং পিতুরেবমন্ত্রবৎ।
ন কেবলং তদ্‌গুরুরেক পার্থিবঃ ক্ষিতাবভূদেকধনুর্দ্ধরোঽপিসঃ॥"

রঘুবংশ ৩য় সর্গ।

অপরদিকে চিত্ত ও চরিত্র সুদৃঢ়ীকরণ তথা কষ্ট সহিষ্ণু মানবে পরিণত করণ ইত্যাদি উচ্চ লক্ষ্য অভিমুখী হিন্দু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাপদ্ধতির কৃপায় পূর্ব্বে এদেশে কিরূপ অসাধারণ বীরপুরুষ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা এদেশের পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাস পাঠকগণ মধ্যে কে না জানিতেছেন ?

উপরিস্থ ব্যক্তির আদেশ পালনে সদা সমুদ্যত থাকা, বিলাতী সমর বিদ্যাশিক্ষা পদ্ধতির একটা প্রধান লক্ষ্যীভূত বিষয় হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু সমরবিদ্যারও ইহা অঙ্গীভূত সামগ্রী ছিল।

শত্রুবিজয়-যোগ্যতাতে এবং যুদ্ধবিদ্যা-পাণ্ডিত্যে ভারত-ইতিহাসে, পরশুরামের প্রতিষ্ঠা অতুলনীয়। এই পরশুরাম বাল্য জীবনে, পিতৃ আজ্ঞা পালন কার্য্যে যে অত্যদ্ভূত কৃতিত্ব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহারও তুলনা জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাই। কোন কারণ বশতঃ, ইঁহার পিতা ঋষি জমদগ্নি, পরশুরামকে তাঁহার মাতৃশিরশ্ছেদন করিতে আদেশ করেন। ব্রাহ্মণ বালক পরশুরাম পিত্রাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, অক্ষুব্ধচিত্তে কুঠারাঘাতে মাতার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। জমদগ্নি পুত্রের এবম্বিধ অসাধারণ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা গুণ দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইয়া পুত্রকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পরম মাতৃভক্ত পরশুরাম নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলকর অন্য কোন বর পাইবার কিছু মাত্র আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, মাতার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির জন্য পিতার নিকট করজোড়ে প্রার্থনা জানাইলেন। জমদগ্নি পুত্রের ইদৃশ আচরণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তন্মুহুর্ত্তেই তপোবলে পরশুরামের জননীকে

পুনর্জ্জীবিত করিলেন। বাল্যে যে পরশুরাম যোদ্ধৃ জীবনের প্রধান সম্পদ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা গুণের অসাধারণ বিকাশ নিজ চরিত্রে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, সেই পরশুরাম যৌবনে পদার্পণ করিয়া অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া ভারতের সর্ব্বজনপূজ্য হইয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, পরন্তু এই পরশুরামের অসাধারণ অধ্যবসায়-শক্তি এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাগুণসঞ্জাত কার্য্যাবলি মহাভারতে এবং নানা পুরাণে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত থাকিয়া লোক-শিক্ষার্থে চারিযুগ ব্যাপী দীপ্তিমান্ দৃষ্টান্তস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। *

প্রাচীন ভারতের সমরবিদ্যা শিক্ষাদান পদ্ধতির সহিত আধুনিক ইয়োরোপীয় সমরবিদ্যা শিক্ষাদান পদ্ধতির পার্থক্য দেখাইবার জন্য উপরে মহাভারত হইতে পরশুরাম উপাখ্যানের একাংশ উদ্ধৃত করিলাম। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জনষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেমস্ মিল, তাঁহার পুত্রকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত প্রস্তুত করিবার জন্য যেমন পুত্রের ভূমিষ্ঠ-দিন হইতেই দৃঢ়ব্রতী হইয়াছিলেন,

---

* পিতৃশত্রু ক্ষত্রিয়কুল সমূলে নাশ করিয়া দৃঢপ্রতিজ্ঞ পরশুরাম শত্রুশোণিত দ্বারা পাঁচটী সুবৃহৎ হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই শোণিত-হ্রদ হইতে অঞ্জলিপূর্ণ রক্ত তুলিয়া লইয়া পরশুরাম পিতৃ-তর্পণ করিয়াছিলেন। এখনও পঞ্জাব প্রদেশে এই পাঁচটি হ্রদ তীর্থ নামে খ্যাত রহিয়াছে। দ্বাপর যুগেও এই পাঁচটি মহাতীর্থরূপে পূজিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে এই শোণিত-হ্রদ দেখাইয়াই বলিয়াছিলেন—

"অমী রামহ্রদাপঞ্চ দৃশ্যন্তে পার্থ দূরতঃ।
তেষু সন্তর্পয়ামাস পিতৄণ্ ক্ষত্রিয়শোণিতৈঃ॥"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

এবং তাহারই ফলে পুত্রকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ পরশুরামকে একজন মহাযোদ্ধা প্রস্তুত করিবার জন্যই ঋষি জমদগ্নি প্রথম হইতেই মহা উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ পিতামাতার বহুকালব্যাপী অসাধারণ সাধনাতেই কেবল পরশুরামের ন্যায় দিগ্‌বিজয়ী পুত্রলাভ সম্ভবিতে পারে। তিন বৎসরের জন্য Sandhurst অথবা Woolwich সমর বিদ্যালয়ের এক কক্ষে পুত্রকে রাখিয়া দিয়া পুত্রকে অল্পব্যয়ে ও সহজে একজন সৌখিন সৈনিক পুরুষ প্রস্তুত করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু একজন অর্জ্জুন, একজন কর্ণ কিম্বা একজন ভীষ্ম প্রস্তুত করিবার উপাদান সামগ্রী এবং শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। বিলাসে অভিষিক্ত হইয়া বিলাতের সৈনিক জীবনের শিক্ষা কার্য্যের সূত্রপাত হয় আর উচ্চপদ, উপাধি ও রাজসম্মান দ্বারা সচরাচর তথাকার সৈনিক জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের পরিসমাপ্তি সাধিত হইতে দেখা যায়; পক্ষান্তরে বিলাসবর্জ্জন এবং তাপস জীবনকে আশ্রয় করিয়াই এখানে সেকালে সমরবিদ্যার অক্ষর পরিচয় করিতে হইত আর অন্তিমে ধর্ম্মরক্ষার্থে ধর্ম্মযুদ্ধে জীবনপাত করিয়া যোদ্ধাকে স্বজাতির এবং নিজের ঊর্দ্ধগতির পথ উন্মোচন করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইত; কাজেই এই দুই বিভিন্ন স্থানের সমরবিদ্যা শিক্ষা প্রাপ্তির প্রকৃতি পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন হইয়া রহিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তথাপি যুদ্ধকার্য্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি ব্যাপারে, পৃথিবীর দুই সুদূরপ্রান্তে সংস্থিত এই দুই দেশের রীতি নীতির মূলতত্ত্বগত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে

পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দুর্গ নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় কথারই আলোচনা করা যাউক।

আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা দুর্গের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে—

"দুর্গস্থ এক ধনুর্দ্ধর পুরুষ (বাহিরের) শত যোদ্ধার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিবেন; এতাদৃশ শতাধিক দশসহস্র বীরের যেখানে পরাজয় হয়, সেই স্থানই বিশেষ দুর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। জলদুর্গ, ভূমিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, অরণ্যদুর্গ, বলদুর্গ, শৈলদুর্গ, পরিখাতদুর্গ প্রভৃতি রাজা রাজ্য রক্ষার্থে এই অশেষ প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন। রাজা দুর্গ নির্ম্মাণ করত ত্রিকোণ অথবা ধনুরাকৃতি একটী পুরনির্ম্মাণ করিবেন, কিম্বা চতুষ্কোণ বর্ত্তুলাকারই বা করুন; এতদ্ভিন্ন অন্যথা করিলে নগর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু মৃদঙ্গাকৃতি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে সততই স্বকুল বিনাশ হইতে থাকে। পূর্ব্বকালে রাক্ষসরাজ দশানন এ প্রকার লঙ্কা দুর্গে বাস করায় স্বকুল সংহার হয়, আর বলি রাজার শোণিত নগর তেজোদুর্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেইহেতু তিনিও অচিরকালে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। মায়াবী শাল্ব রাজার শ্বেতাক্ষপুরীতে মৃদঙ্গাকার দুর্গ নির্ম্মাণ করায় ঐ শাল্বপুরীও অতি শীঘ্র শ্রীবিহীন হইয়াছিল। অযোধ্যা নগরীতে সূর্য্যবংশজ মহারাজ ইক্ষ্বাকু ধনুরাকৃতি একটী দুর্গ বিনির্ম্মাণ করেন; তদবধি কতকাল পর্য্যন্ত ঐ ইক্ষ্বাকুবংশ গঙ্গাস্রোতের ন্যায় চলিতেছে।" *

* শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কালিকা-পুরাণের বঙ্গানুবাদ ৮৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

Col. J. F. Lewis কৃত Text Book of Fortification and Military Engineering পুস্তকেও আমরা ধনুরাকৃতি বক্র parapet যুক্ত দুর্গ প্রতিষ্ঠার প্রশংসাবাদ দেখিতে পাইতেছি। বাহিরের কামানের গোলাতে এরূপ দুর্গের অনিষ্ট অল্প সাধন করিতে পারে। পূর্ব্বকালেও এদেশে দুর্গ রক্ষা কার্য্যে যে একরূপ কামানবৎ যন্ত্র ব্যবহার করা হইত, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

"দুর্গং চ পরিখোপেতং বপ্রাট্টালিক সংযুতম্।
শতঘ্নী যন্ত্র মুখ্যৈশ্চ শতশশ্চ তথাযুতম্॥"

উপরোদ্ধৃত শ্লোকের "শতঘ্নী" কামান ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

মনুও বলিয়াছেন—

"একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাৎ দুর্গং বিধীয়তে॥
তস্মাদায়ুধ সম্পন্নং ধন ধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ॥" মনুঃ।

যুদ্ধ-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গনির্ম্মাণ পদ্ধতির পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য। যখন তীর ধনুকে এবং বর্শা তরওয়াল কিরিচে যুদ্ধ চলিত, তখন প্রবল শত্রু পক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য উচ্চ প্রাচীর এবং পরিখা পরিবেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করাই অনেক স্থলে পর্য্যাপ্ত ছিল। এ সময়ে দুর্গের বাহিরের

আকারের দিকে দৃষ্টি রাখিবার তাদৃশ প্রয়োজন ছিলনা। দুর্গম গিরি দুর্গেরই এ সময়ে প্রতিষ্ঠা অধিক ছিল। যুদ্ধে কামান বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পরে ইয়োরোপে যে সকল বড় বড় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ সকল দুর্গের বাহির দিকের আকার কতকটা গোলাকৃতি বা ধনুকাকৃতি করিয়া নূতন ধরণে দুর্গ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের এদেশে কিন্তু চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও ধনুকাকৃতি বা প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পাকৃতি দুর্গ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল। তন্ত্রে নানা দেব দেবীর নাম যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল যন্ত্রের চিত্রের মধ্যে দুর্গ রচনা ঘটিত গুঢ় তত্ত্বাদিও সুকৌশলে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অন্ততঃ অনেক-গুলি যন্ত্রের চিত্রকে প্রথম দর্শনে দুর্গের চিত্র বলিয়াই মনে হয়। তন্ত্র-শাস্ত্রের একাংশের সহিত এদেশের লুপ্তপ্রায় সমর বিদ্যার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং কোন্ সময় হইতে কিসূত্রে উহার সৃষ্টি হইয়াছে, এ সকল কথার আলোচনা সময়ান্তরে করিব।

দুর্গ নির্ম্মাণের কথার পরে ব্যূহ রচনার কথা সহজেই আমাদের মনে স্থান পাইতে পারে। মহাভারতের পাঠকগণকে ইহা আর স্মরণ করিয়া দিতে হয় না যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া কিভাবে কুরু সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং কিরূপ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া সেখানে জীবনপাত করিয়াছিলেন। বীর মিত্রোদয় গ্রন্থে নানা প্রাকারের ব্যূহ রচনার কথা লিখিত আছে। ইহাদের নাম—

কাকব্যূহ, বলাকাব্যূহ, শ্যেনব্যূহ, ক্রৌঞ্চব্যূহ, শকটব্যূহ, সিংহব্যূহ, পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ, মাল্যব্যূহ, সর্পব্যূহ, অগ্নিব্যূহ, খলকব্যূহ।

কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং কোন্‌রূপ শত্রুকে পরাজয় করিবার জন্য কোন্ সময়ে কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, এসকল কথারও উল্লেখ ঐ গ্রন্থে আছে। প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে এখানে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে নিরস্ত থাকিলাম।

বর্ত্তমান সময়ের জলযুদ্ধে আজি কালি যেমন সব্‌মেরিন জলযান ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পুরাকালে এদেশে ঠিক সেরূপ জলযানের ব্যবহার না থাকুক, উহারই প্রকার ভেদ—"জলনিবাস কক্ষ" প্রস্তুত করিয়া সমুদ্র বা হ্রদের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহারই আশ্রয় লইয়া যে রাজারা প্রয়োজন স্থলে দীর্ঘকাল আপন জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মহাভারতে আমরা দেখিতে পাইতেছি। *

আজি কালিকার অনেক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের চিত্তে এরূপ একটা বিষম ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্ব-কালে এ দেশের যোদ্ধৃগণ মধ্যে কেবল ধনুক বাণ লইয়াই যুদ্ধ চলিত। মহাভারত রামায়ণ ও পুরাণের বহুস্থানে বহুবিধ অস্ত্র ব্যবহারের সুবিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। বাল্মিকী রামায়ণের বালকাণ্ডে যে স্থানে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে যজ্ঞ রক্ষার জন্য নানাবিধ

* যাঁহারা এইরূপ জলের ভিতরের রক্ষাদুর্গের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহাভারতের শৈল্যপর্ব্ব ২৯ অধ্যায় দেখিবেন।

অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বর্ণিত হইয়াছে, সেই খানে প্রসঙ্গাধীন এই সকল অস্ত্রের নামোল্লেখও আছে।

দণ্ড, চক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, বজ্র, শূল, ব্রহ্মাস্ত্র, বাণ, ধনু, গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, অক্ষণ, পিণাক, নারায়ণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, হংসশির, ক্রোধাস্ত্র, নন্দনাস্ত্র অসিদত্র, মোহনাস্ত্র, প্রখ্যাপনাস্ত্র, প্রক্ষমণাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলপনাস্ত্র, মদনাস্ত্র, মানবাস্ত্র, সোমাস্ত্র, সম্বর্ত্তাস্ত্র, মুষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াস্ত্র, ভগাস্ত্র, প্রভাস্ত্র, ত্বষ্ট্রাস্ত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে কোন্ অস্ত্র কি ভাবে এবং কিরূপ যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুপক্ষের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা বহু অনুসন্ধান করিয়াও এতক আমি পাইতে পারি নাই। মহাভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকাই স্বাভাবিক; এ জন্য ইহাতে অথবা পুরাণ গ্রন্থে অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা কৌশলের কথা পাইবার আমরা আশাও করিতে পারি না। যে সকল প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা গ্রন্থে এই সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা এখন পাইবার উপায় নাই। তাহার কারণ এই যে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মমতের প্রাবল্য সময়ে যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত ঐ শ্রেণীর গ্রন্থসকল নানাস্থান হইতে যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও মুসলমান রাজ্য শাসন সময়ে নষ্ট করা হইয়া থাকিবে। ইদানীং এই শ্রেণীর দুই একখানি গ্রন্থ যাহা কদাচিৎ কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও অবস্থা এতই শোচনীয় এবং উহা এতই অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ যে, তদ্দ্বারা

সমর বিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রাচীন তত্ত্ব অতি অল্পই উদ্ধার করা সম্ভবিতে পারে। এইরূপ একখানি হস্ত লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ—যাহার নাম "ধনুর্ব্বেদ"—কাশীর মহারাজার লাইব্রেরীর এককোণে একটু স্থান প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কোনক্রমে নিজ জর্জ্জরিত দেহের অস্তিত্বটুকু অদ্যাপি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই অঙ্গহীন "ধনুর্ব্বেদ" হইতে একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"উত্তানৌ চরণৌ নাম জানুনী দ্বিগুণং তথা।
ইদং সম্পূষ্টকং নাম বিধিস্তৈ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
সমদণ্ডায়তৌ পাদৌ কিঞ্চিচ্চৈব নিবর্জ্জিতৌ।
বিস্তারাৎ ষোড়শাঙ্গুল্য মুক্তস্থাসম্ মুনীশ্বর॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, এদেশেও পুরাকালে কতকটা আধুনিক বন্দুকধারী সৈন্যের ন্যায় হস্তপদ সঞ্চালনের প্রক্রিয়া স্থির করিয়া ধনুকে বাণ সংযোগ ও ধনুক হইতে তীর নিক্ষেপ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। *

* সেকালের যুদ্ধে ধনুকে তীর স্থাপন ও তীর নিক্ষেপণাদি কার্য্য সময়ে যেমন হস্তপদাদির ভাব রক্ষা করিবার উপদেশ আমাদের প্রাচীন ধনুর্ব্বেদ গ্রন্থের উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এখনকার যুদ্ধে বন্দুক ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারেও সৈন্যদের প্রতি ঠিক কতকটা ঐ শ্রেণীরই উপদেশ প্রদত্ত হইতে দেখা যায়। বিলাতের সৈন্যদের শিক্ষা পুস্তক Musketry Exercises পুস্তকে এ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"To accustom the muscles to the strain of prolonged firing the following exercises will be performed daily during

কাশী-মহারাজের লাইব্রেরীতে যে একখণ্ড হস্ত লিখিত "ধনুর্ব্বেদ" গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং যাহার উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে, তাহাতে প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন টীকাকার মধুসূদন সংগৃহীত "প্রস্থানভেদ" নামক গ্রন্থে বর্ণিত ধনুর্ব্বেদের প্রায় কোন কথাই নাই। শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের নিকটে যে হস্ত-লিখিত "প্রস্থানভেদ" গ্রন্থ আছে, তাহাতে ধনুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে—

"ধনুর্ব্বেদঃ পাদ চতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। ততো প্রথমোদীক্ষাপাদঃ। দ্বিতীয় সংগ্রহপাদঃ। তৃতীয় সিদ্ধিপাদঃ চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ। প্রথমেপাদে ধনুর্লক্ষণমধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতং। অত্র ধনুঃ শব্দশ্চাপেরূঢ়োঽপি ধনুর্ব্বিদ্যায়ুধে প্রবর্ত্ততে। চতুর্ব্বিধং মুক্তমমুক্তং মুক্তামুক্ত যন্ত্রমুক্তং চ। মুক্তং চক্রাদি। অমুক্তং খড্গাদি। মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি। যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমুচ্যতে। অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্মবৈষ্ণবপাশুপত প্রাজাপত্যাগ্নেয়াদি ভেদাদনেকবিধং। এবং সাধিদৈবতেষু সমন্ত্রকেষু চতুর্ব্বিধায়ুধেষু যেষামধিকারঃ ক্ষত্রিয়কুমারাণাং তদনুযায়িনাঞ্চ তে সর্ব্বে চতুর্ব্বিধাঃ পদাতিরথগজতুরগারূঢ়াঃ। দীক্ষাভিষেকশকুনমঙ্গল-

---

the elementary training of recruits, and frequently by trained Soldiers. * * * Points to note :—(1) Body well-balanced. (2) Left elbow well under rifle. (3) Good bed for the butt (4) Firm grip with both hands. (5) Eye well back from the cocking piell. (6) Sights perfectly upright. (7) Left heel slightly behind left knee."

করণাদিকং চ সর্ব্বমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতং। সর্ব্বেষাং শাস্ত্রবিশেষাণামাচার্য্যস্য চ লক্ষণপূর্ব্বকং সংগ্রহণপ্রকারোদর্শিতঃ দ্বিতীয়ে পাদে। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষাণাং পুনঃপুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতাসিদ্ধি করণমপি নিরূপিতং তৃতীয়ে পাদে। এবং দেবতার্চ্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানামস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থপাদে নিরূপিতং ক্ষত্রিয়াণাং স্বধর্ম্মাচারণং যুদ্ধং। দৃষ্টস্য দণ্ডচৌরাদিভ্যঃ প্রজাপালনং চ ধনুর্ব্বেদস্য প্রয়োজনং। এবঞ্চ ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যাদিক্রমেণ বিশ্বামিত্রপ্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রং।"

উদ্ধৃত অংশের বাঙ্গলা মর্ম্মানুবাদ এই—

ধনুর্ব্বেদ বিশ্বামিত্র প্রণীত। ইহা চতুষ্পাদযুক্ত। তাহার প্রথম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয় সংগ্রহপাদ, তৃতীয় সিদ্ধিপাদ, চতুর্থ প্রয়োগপাদ। প্রথম পাদে ধনুর লক্ষণ ও অধিকারী নিরূপণ করা হইয়াছে। ধনু, শব্দের রূঢ়ার্থ চাপ হইলেও এখানে ধনুর্ব্বিদ্যা অস্ত্র-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। মুক্ত অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্তভেদে ইহা চারি প্রকার। চক্রাদি যন্ত্রমুক্ত, খড়্গাদি অমুক্ত, শল্যাদি অবান্তর ভেদে মুক্তামুক্ত এবং শরাদি যন্ত্রমুক্ত। ইহার মধ্যে মুক্তকে "অস্ত্র" ও অমুক্তকে "শস্ত্র" বলে। ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, পাশুপত্য, প্রাজাপত্য ও আগ্নেয়াদি ভেদে এই অস্ত্র বহুবিধ। এই সাধিদৈব ও সমন্ত্রক চতুর্ব্বিধ আয়ুধে ক্ষত্রিয় কুমারগণের যেমন অধিকার, তাহারা তদনুযায়ী চতুর্ব্বিধ পদাতিক, রথ, গজ, অশ্বারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করে। দীক্ষা, অভিষেক, শকুণ ও মঙ্গলকরণদি সকল বিষয় প্রথম পাদে নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সকল প্রকার বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের

আচার্য্যের লক্ষণ ও সংগ্রহণ প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে গুরুসম্প্রদায় সিদ্ধ শস্ত্র বিশেষের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধি ও দেবতা সিদ্ধ প্রকরণ কথিত হইয়াছে। আর দেবার্চ্চনা অভ্যাসাদি দ্বারা সিদ্ধ অস্ত্র বিশেষের প্রয়োগরূপ চতুর্থ পাদে নিরূপিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মাচরণই যুদ্ধ। দুষ্টের দমন ও দস্যুদিগের হস্ত হইতে প্রজারক্ষার্থ ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন। ব্রাহ্ম প্রাজাপত্যাদি ক্রমে বিশ্বামিত্র প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ।

কাশীর মহারাজার লাইব্রেরীস্থিত "ধনুর্ব্বেদে" উপরি লিখিত বিষয় সকল বিস্তারিতরূপে বর্ণিত না থাকিলেও অস্ত্রাদি প্রয়োগের কথা এবং অস্ত্রের শ্রেণী বিভাগ যে ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করার যোগ্য; এজন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইয়াছে—

"প্রত্যেকং পঞ্চধা তদ্ধি কথ্যতে স্থানভেদতঃ।
প্রথমং মন্ত্রমুক্তন্তু করমুক্তং দ্বিতীয়কম্॥
মুক্তসংধারিতস্তদ্বদমুক্তং চ চতুর্থকম্।
বাহুযুদ্ধং তথাখ্যাতং পঞ্চমং সর্ব্বসম্মতম্॥
তচ্ছস্ত্রাস্ত্রোচ্চসম্পাত্যা দ্বিবিধন্তু ততঃস্মৃতম্।
পুনর্দ্বৈবিধ্যকং তস্য ঋজুমায়াবিভেদতঃ॥
ক্ষেপণীয়াদি মন্ত্রোত্থ মুক্তঞ্চৈতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
শক্তিতোমরপাষাণাঃ পাণিমুক্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
মুক্তং সন্ধারিতং তদ্বৎ প্রসারাধ্বপি যন্ত্রবেৎ।
খড়্গাদিকং তথামুক্তং বাহুযুদ্ধং গতায়ুষং॥"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রত্যেকটি স্থান ভেদে পাঁচ প্রকার কথিত হয়। প্রথম—মন্ত্রমুক্ত, দ্বিতীয়—করমুক্ত, তৃতীয়—মুক্তসন্ধারিত, চতুর্থ—অমুক্ত, পঞ্চম—সর্ব্বসম্মত বাহুযুদ্ধ। শস্ত্রও বহুপ্রকার; তাহাও আবার সরল ও বক্র ভেদে বহুবিধ। ক্ষেপণীয়াদি মুক্ত বলিয়া কথিত হয়। শক্তি, তোমর ও পাষাণকে পাণিমুক্ত বলে। প্রসারাধ্ব যাহা কিছু তাহাকে মুক্তসন্ধারিত এবং বাহু যুদ্ধের অস্ত্র খড়্গাদিকে অমুক্ত বলে।

এই সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বকালে এ দেশের যোদ্ধাগণ সাঁওতাল ভীলের ন্যায় কেবলমাত্র ধনুক ও বাণের সাহায্যেই যুদ্ধ করিতেন না; পরন্তু যুদ্ধ কার্য্যে নানা শ্রেণীর অস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

সম্প্রতি ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে, জর্ম্মাণাবিষ্কৃত বিষাক্ত গ্যাসের গোলা ব্যবহারের কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি। "সম্মোহন" অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা ঐরূপ কোন বিষাক্ত ধূম সৃষ্টি করিয়া প্রাচীনকালে এ দেশেও যে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রাণে না মারিয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া যুদ্ধজয়ী হইবার চেষ্টা করা হইত, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট উপাদান মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে আমরা পাইতে পারি। রুদ্রযামল তন্ত্রে ষোলটি সামগ্রী একত্রিত ও চূর্ণিত করিয়া সম্মোহনধূম প্রস্তুত করিবার সংকেত লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ধূপের ধূম তন্ত্রোক্ত অভিচারাদি কার্য্যে সেকালে ব্যবহৃত হইত। এইরূপ ধূমোৎপাদক বস্তু অগ্নি সংযুক্ত করিয়া তীর ধনুকের সাহায্যে শত্রু সেনা মধ্যে নিক্ষেপ করা বিশেষ কঠিন কার্য্য

নহে। "আগ্নেয়াস্ত্র" "বরুণাস্ত্র" ইত্যাদির নামেই ঐ সকল অস্ত্রের কার্য্যশক্তির কতক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসন্ধানের ফলে পুরাকালে এদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে যত বিভিন্ন প্রকারের এবং যেরূপ জীবধ্বংসকর ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্র সকল ব্যবহৃত হইত, আমরা জানিতে পারিতেছি, তাহার তুলনাতে, এসময়ের জর্ম্মণ ফরাসী এমেরিকান এবং ইংরাজ জাতির আবিস্কৃত দুর পাল্লার Krupp Gun, অফুরন্ত গোলাবর্ষণকারী Maxim Gun বা Machine Gun এবং Shell, Sharpnel, Bomb, Grenade গোলা গুলি, বিষাক্ত গ্যাস এবং বিস্ফোরক চূর্ণগুলিকে বালকবালিকার খেলিবার সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে কোনই বাধা নাই। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ অবসানে ভীম এবং অর্জ্জুন ক্রোধান্ধ হইয়া যখন পরস্পরকে নষ্ট করিবার উদ্দেশে পরস্পরের প্রতি "ব্রহ্মশির" নামক মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন ঋষি এবং দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঐ অস্ত্রের প্রয়োগ ব্যবহার জানিলেও ত্রিলোকধ্বংসকর ঐরূপ ভয়ঙ্কর অস্ত্র এরূপ যুদ্ধে বাহির করা তাঁহাদের উভয়ের পক্ষেই অতিশয় অবৈধ কার্য্য হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান এরূপ একটা যুদ্ধাস্ত্রের জন্মদাতা আজিও হইতে পারেন নাই; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, পুরাকালে এদেশের মহাতপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ জড় ভাবাপন্ন বস্তুর ভিতরে চৈতন্যের উন্মেষণ করিবার কোনরূপ একটা কৌশল আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই শক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহারই ফলে তাঁহাদের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত

যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা স্থল বিশেষে আদেশবাহী ভৃত্যের কার্য্যের মতন কার্য্য তাঁহারা সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিতেন। ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক-গণ তাড়িতের দ্বারা ইদানীং অনেক দুরূহকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া লইতেছেন সত্য, কিন্তু বিদ্যুৎসঞ্চালনী তন্ত্রে চৈতন্য সংযুক্ত তাড়িৎ শক্তির দ্বারা যত কার্য্য সাধন করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও আজিও ইয়োরোপের জড় বিজ্ঞানবিৎ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত কর্ম্মসিদ্ধ উপ-দেষ্টার অভাবে যেমন আয়ুর্ব্বেদের নানা গ্রন্থে উক্ত, নানা পীড়াতে সর্ব্বদা প্রয়োজ্য, ঋষভ, জীবক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী এই আটটি মহৌষধির নামমাত্র আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, বস্তুর সহিত কুত্রাপি পরিচিত নহি, হয় ত আমাদের নিকটেই এই সকল গাছ গাছড়া দাঁড়াইয়া আছে, অথচ অপরিচিত কুটুম্বের ন্যায় আমরা কেহই কিছু জানিতে পারিতেছি না, সেইরূপ কর্ম্মসিদ্ধ উপদেষ্টার অভাবে যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত দুই চারিখানা প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ যাহা বহু কষ্টে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এবং নানা তন্ত্রে আত্মরক্ষা এবং শত্রুকে নিহত করিবার জন্য যে সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুতের এবং প্রয়োগের কৌশল সাঙ্কেতিক ভাষাতে লিখিত রহি-য়াছে, চক্ষুর উপরে দেখিতেছি, তাহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহের ক্ষমতা আমাদের আজ কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও অতি ভগ্ন অট্টালিকাতে যেমন নিজে বাস করিতে না পারিলেও দূর হইতে তাহার অদ্ভুত শিল্পকলা ও কারুকার্য্যগুলি সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে, তেমনি এই সকল

শাস্ত্রগ্রন্থের ভিতর হইতে এখানকার কর্ম্মোপযোগী তত্ত্ব সকল নিষ্ক্রান্ত করিয়া লইতে না পারিলেও উহা যে এখনও এদেশের প্রাচীনকালের সমরবিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে, এ কথা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে।

এখানে আর একটি কথা নিবেদন করিয়া এ প্রস্তাবের ইতি করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীনত্বের পক্ষপাতিতার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, ব্রাহ্মণ্য সমর-বিদ্যার কথার আলোচনা প্রসঙ্গে, আমাদের অতীত কালের ক্ষুদ্র গৌরবের বিষয়গুলিও অতিরঞ্জিত করিয়া অতিশয় বৃহৎ আকারে আমরা দেখিতেছি এবং আমাদের পাঠকগণকে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি—এইরূপ একটা অসঙ্গত চিন্তা যদি কাহারও চিত্তে স্থান পাইয়া থাকে, তবে প্রার্থনা করি, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিবেন। এরূপ প্রার্থনা করিতে এইজন্য সাহসী হইতেছি যে—ব্রাহ্মণ্য সমর কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা কার্য্যে এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ লেখকই প্রথম পথ প্রদর্শক নহেন। ইতিপূর্ব্বেও বহু ইংরাজ, ফরাসী এবং জর্ম্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের সামরিক শৌর্য্য বীর্য্যের এবং সমরক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন পারদর্শিতার উচ্চকণ্ঠে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির তাৎকালিক সেক্রেটারি মিঃ হেন্‌রি টরেন্স পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে উক্ত সভার জর্নালে তাঁহারই লিখিত "ভারতে ব্রাহ্মণের বিজয়" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে এই কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—

"Nothing is more easy than to prove by reference

to ancient Sanskrit authorities, that the skill in arms of the brahminical race was really such, as to render them no contemptible opponents to troops as highly disciplined as were those of Egypt. The institutes of Manu, which in their present shape, must have been in existence, according to Sir William Jones' calculation, 880 years before our era, contain in their seventh chapter definite instructions, not only as to the policy of war, but as to its detail, prescribing the seasons for military operations the division of the army employed, elephants cavalry, cars, infantry, officers, attendants ; and the formations in which the troops should advance into action, or adopt on the line of march. Those were various; such as line, column, wedge, or double wedge, rhomboid with far extended wings. with other formations involving the establishment of reserves—of tried men, or distinguished by known marks, who are excellent both in sustaining a charge and in charging, who are fearless and incapable of desertion." *

ইংরাজীভাষা অনভিজ্ঞ ত্রিশূল পাঠকের বুঝিবার সুবিধার্থে উপরে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

* Journal of the Asiatic Society of Bengal VoL XIX No 1 প্রকাশিত উক্ত সভার সেক্রেটারী মিঃ হেনরী টরেন্স লিখিত Brahminical conquerors of India প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

মিসর দেশের উচ্চ শিক্ষিত সেনাগণের সমতুল্য যোদ্ধাগণের নিকটেও ব্রাহ্মণ জাতির অস্ত্রবিদ্যা-কৌশল যে তুচ্ছ ছিল না, তাহা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে অতি সহজে সপ্রমাণিত হয়। যে মনুসংহিতা সার উইলিয়ম জোন্সের হিসাবে খ্রীষ্ট জন্মের ৮৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে, তাহার সপ্তম অধ্যায়ে কেবল মাত্র যুদ্ধ নীতির উপদেশই নহে, পরন্তু বিশেষরূপ সামরিক কার্য্য সমূহের কাল নির্ণয় এবং হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক সেনানী ও পরিচারকাদির বিভাগকরণ এবং যে ব্যুহ বা নানারূপে শ্রেণী বদ্ধ প্রণালীতে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল ব্যূহ নানা প্রকারের; যথা—রেখা, স্তম্ভ বিভাগ, দ্বিবিভাগ, রম্বো-ডাকার প্রভৃতি এবং তাহাদের বহুবিস্তৃত পার্ষ্ণিব্যূহ ও নানা প্রকারে সংরক্ষিত সৈন্যগণের শ্রেণীবন্ধন এমন সকল সৈনিক দিয়া গঠিত হইত, যাঁহাদের যুদ্ধকৌশল বহুপরীক্ষিত ও সুবিখ্যাত ছিল এবং আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় ব্যাপারেই যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও নির্ভীক ছিলেন এবং সমরক্ষেত্র হইতে যাঁহারা কখন পলায়ন করিতেন না।

উক্ত ইংরাজ লেখক, পুরাকালে এদেশের ব্রাহ্মণদের সামরিক যোগ্যতা যে অতি উচ্চ অঙ্গের ছিল, ইহাই মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, তিনি যুদ্ধকার্য্যের অবসানে, ব্রাহ্মণগণ পরাজিত শত্রুর প্রতি যে কিরূপ মহানুভবতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে জানিতেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐ প্রবন্ধের অন্য এক স্থানে ব্রাহ্মণদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। একটু দীর্ঘায়তন হইলেও

এ অংশও এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য। ব্রাহ্মণ যোদ্ধার, শত্রুর-প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশের কথা তুলিয়া তিনি বলিতেছেন—

"There is a generosity of feeling manifested in the warlike practices of this early time, which bespeaks a singular elevation of sentiment : thus the brahman, we evidently learn, took no advantage in the field of that sacred charaeter, which if violated "by a blow even with a blade of grass" given intentionally condemned the striker "to twenty-one transmigrations in the womb of impure animals." If even the blow be struck in ignorance of the law "so as to shed blood from the body of a brahman, not engaged in battle," a very heavy, though indefinite, punishment is assigned for it. There is again a very manly and humane spirit in the following provisions :—"Let no man engaged in combat, smite his foe with sharp weapons concealed in wood. nor with arrows mischievously barbed, nor with poisoned arrows, nor with darts blazing with fire." "Nor let him in a car or on horseback, strike his enemy alighted on the ground ; nor an effemimate man ; nor one who sues for life with closed palms ; nor one whose hair is loose and obstructs his sight ; nor one who sits down fatigued ; nor one who says, I am thy captive." "Nor one who sleeps ; nor one who has

lost his coat of mail ; nor one who is marked nor one who is disarmed ; nor one who is a spectator, but not a combatant ; nor one who is fighting with another man." "Calling to mind the duty of honourable men, let him never slay one who has broken his weapon ; nor one who is afflicted with private sorrow ; nor one who has been grivously wounded ; nor one who is terrified ; nor one who turns his back." It is impossible for any code of the most exalted chivalry to exceed in generosity, the noble temper of these prohibitions, and we must acknowledge that the people among whom such laws were current, must have attained a very high degree of civilization." *

এ অংশের আর বাঙ্গালা অনুবাদ এখানে দিলাম না। ব্রাহ্মণগণ দুঃসময়ের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আজি দুর্দ্দশার অন্তিম খাদে আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও সেস্থান একটু দূরে রহিয়াছে, যেখানে আসিয়া পৌঁছিলে নিজসম্বন্ধীয় পরমুখের প্রশংসা নিজকণ্ঠ সুরে তুলিয়া লইয়া আবৃত্তি করিবার প্রবৃত্তি হয়। নিজস্থান ফিরিয়া পাইবার আশা, অধঃপতিত ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এখনও একেবারেই ছিন্ন হয় নাই।

---

* Journal of the Asiatic Society of Bengal vol xix no I. প্রকাশিত উক্ত সভার সেক্রেটারী হেনরী টরেন্স লিখিত Brahminical conquerors of India প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ কথা।

(ব্রাহ্মণের দৃষ্টি ভূমি হইতে আলোচিত)

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর লইয়া মাথা ব্যাথা করিবার প্রয়োজন নাই, বলিয়াই বর্ত্তমান যুদ্ধের কথা লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় না। দুঃখের বিষয়, দেশে আদাও মহার্ঘ হইয়া উঠিল, কাযেই যে ব্যাপারে আমাদের নিত্য আহার্য্য সামগ্রী শাকতরকারি পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিল, তাহার কথা লইয়া এখন একটু চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। চিন্তার পথেও বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি অনেক। তবে সাধারণভাবে যুদ্ধের আলোচনা ভিন্ন আরও একটি দিক্ দিয়া এ বিষয়টী দেখা যাইতে পারে। এইটী হইতেছে,—ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপথ হইতে যুদ্ধের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভাব সন্দর্শন। এ সময়ে যে দুর্দ্দশাতে আমরা আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছি, এখান হইতে ব্রাহ্মণের সে দৃষ্টিস্থান বহুদূরে ও বহু উর্দ্ধে; কাজেই সেকালের তপঃশালী ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণের দর্শন-ভূমিতে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধব্যাপারের কথা লইয়া আলোচনা করিবার অধিকার আমাদের এখন নাই; তথাপি ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি, চশমার সাহায্য লইয়া, সুদূরস্থিত বস্তু কতকটা সমীপবর্ত্তী করিয়া লইয়া যেমন দেখিতে চেষ্টা করে, তেমনি শাস্ত্রীয় আলোকের সাহায্য লইয়া আমি আজি একটু এ বিষয় দেখিতে চেষ্টা করিব এবং আমাদের পাঠকগণকেও দেখাইতে যত্ন করিব।

বর্ত্তমান ইয়োরোপের যুদ্ধ ব্যাপারটাকে কোন ব্রাহ্মণই একটা অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া আদৌ মনে করিতে পারেন না; কারণ

তাঁহারা জানেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিশ্বব্যাপী প্রবাহের নীচে অবিরত একটা যে মহাযুদ্ধ চলিতেছে, যাঁহারা তাহা দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের নিকটে এ যুদ্ধ অকুল সাগর বক্ষে একটা অতি ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্রতম জলবুদ্‌বুদের বিকাশ মাত্র। একটা সিংহ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটা প্রকাণ্ড হস্তীর স্কন্ধোপরি উঠিয়া তাহার মস্তক চর্ব্বণ করিতেছে; আবার আর একদিকে, চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না এমন একটা অতি ক্ষুদ্র কীট আর একটা ক্ষুদ্রতর কীটকে ধরিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে; একটা বনস্পতি আর কতকগুলি লতাগুল্ম ও তরুরাজীকে চাপিয়া ধরিয়া নিজের বিপুল দেহ প্রতি-নিয়ত উর্দ্ধে প্রসারিত করিতেছে; একটী স্রোতস্বতী একটা পর্ব্বতকে ধরিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে; নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটা বিশাল গ্রহ, সূর্য্যমণ্ডলের আর একটা গ্রহকে লইয়া টানাটানি করিতেছে; নিজের দেহপুষ্টি করিবার জন্য ক্ষুদ্র একটা পরমাণু আর একটা অণুকে জড়াইয়া ধরিয়া আত্মসাৎ করিতে সতত চেষ্টা করিতেছে। দূরের পরের কথাতে প্রয়োজন কি? আমাদের নিজ দেহের মধ্যেই অনুক্ষণ মহারণ চলিয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দেহের মধ্যস্থিত এই সকল যোদ্ধার আকৃতি প্রকৃতি আমরা এখন অতি সুন্দর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি-য়েছি। ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক ভাষাতে আমাদের দেহবাসী এই শ্রেণীর জীবকে Microbe, Bacteria অথবা Bacillus বলা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা এখন স্থির হইয়াছে, জ্বর, ওলাউঠা, রক্তামাশয়, উদরাময়, এমন কি, সর্দ্দি-কাশি প্রভৃতি সামান্য

সামান্য পীড়াতে আক্রান্ত হইবার সময়েও প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল জীবাণু দ্বারা আমাদের দেহের অংশবিশেষ অধিকৃত হয়। তখন স্বাস্থ্যের অনুকূল আমাদের দেহস্থিত আমাদের রক্ষক জীবাণুর দল উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কোচ সাহেবের মতে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইবার সময়, এই শ্রেণী জীবের এক সম্প্রদায়—যাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে Spirikum cholerae—আমাদের দেহে উহাদেয় বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা পাইয়া এতই দ্রুতবেগে তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া কোটী কোটী যোদ্ধা আমাদের পাকস্থলিরূপ সমর প্রাঙ্গণে দাঁড় করাইয়া দেয় যে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত সৈন্যদল আমরা সহজে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি না—কাজেই উহাদের জয় হইয়া থাকে। দেহত্যাগ করিয়া আমাদের প্রাণবায়ুকে বেলজিয়মের বাদসার ন্যায় তখন অন্যত্র যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পীড়ার বীজাণুর সহিত স্বাস্থ্যের অনুকূল সজীব রক্তসেলরূপ (Blood-cells) সৈন্যদলের যুদ্ধ আমাদের দেহমধ্যে এই ভাবে অবিরতই চলিয়াছে। যখন দেহমধ্যে পীড়ার বীজাণুদল প্রবল হইয়া উঠে, তখনই আমরা পীড়িত বলিয়া আখ্যাত হই, আর যখন উহারা নিস্তেজ বা ম্রিয়মাণ অবস্থাতে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, তখনই আমরা সুস্থ বলিয়া কথিত হই। ফল কথা, আমাদের এই দেহ জীবাণুদের একটা মহাযুদ্ধক্ষেত্র। অহর্নিশি এখানে এই মহাযুদ্ধ চলিতেছে। এই ভাবে, এই সৃষ্টিরাজ্যে একের সহিত অন্যের আত্মসংরক্ষণমূলক সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী হইয়া

রহিয়াছে আর অহর্নিশি তাহারই ঘোর রণবাদ্য ভীমনাদে বাজিতেছে! বিরাট বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধের বিশাল রণবাদ্যের মধ্যে ইহার তুলনায় গোটাকতক জর্ম্মণ, ফরাসী, ইংরাজ, রুষ, তুর্কীর যুদ্ধের ভাঙ্গা ভেরী-নাদ আর পটকা সদৃশ কামানের আওয়াজ এবং জেতার আস্ফালন ও পরাজিতের আর্ত্তনাদ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। যেদিন ব্রাহ্মণের দৃষ্টি বিশ্বপ্রসারিত ছিল, সেদিন তাঁহাদের নিকটে এরূপ যুদ্ধের কথা এজন্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না। এখন ব্রাহ্মণের সে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া মানবের স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে; কাজেই আমরা এখন এ যুদ্ধটাকে একটা বড় ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছি। সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে ইহা যে একটা বড় ব্যাপার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে এরূপ সর্ব্বস্বান্তকারী নৃসংহারী যুদ্ধ আর কখন সংঘটিত হয় নাই। ইহা সত্যও হইতে পারে; কেননা মানব সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতিযুগেই এক একটা বৃহৎ যুদ্ধ ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, দ্বাপরের শেষে বা কলির সন্ধিমুখে ঘটিয়াছিল। তাহার পর পাঁচ হাজার বৎসর গত হইল। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে ছোট বড় অনেক যুদ্ধেরই অবতারণা হইয়াছে; কিন্তু সেগুলির একটীও মানব সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তক যুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে ভারতের সামাজিক অবস্থার যে একটা বিশাল বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, একথা এদেশের অনেক ঐতিহাসিক লেখক স্বীকার করিয়া থাকেন।

এই "ভারত" যে বর্ত্তমান সময়ের ম্যাপের "ইণ্ডিয়া" নহে, এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি সুদূর ভূভাগ লইয়া যে ভারত সাম্রাজ্য সে সময়ে সংগঠিত ছিল, তাহা হিন্দুশাস্ত্র যাঁহারা একটুও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে, এই বিপুল ভূভাগের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন যে কোন্ সূত্রে কি ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ধরিতে পারিলে, এ যুদ্ধে সেরূপ কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা আমরা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রহস্য বুঝিতে হইলে আমাদিগকে আরও কিছু অগ্রে যাইতে হইবে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যযুগে প্রথমতঃ দেবাসুরের একটা মহাসংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল।* তৎপরে বৃহৎ যুদ্ধ, ত্রেতাযুগে রাম রাবণের যুদ্ধকে বলিতে বাধা নাই। তাহার পরে দ্বাপর যুগের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ একটা বৃহৎ যুদ্ধ বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে। চতুর্থ যুগের অর্থাৎ কলিযুগের সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধ কি না, তাহা এখনও নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে না; কারণ এখন কলিযুগের প্রারম্ভ কালমাত্র। ইহার পরে ইহা অপেক্ষাও সর্ব্বধ্বংসকারী আরও কোন বৃহত্তর মহাযুদ্ধের সংঘটন হইবে কি না, এ কথার উত্তর ভবিষ্যৎ কালই কেবল দিতে পারেন। তথাপি এই পাঁচ বৎসরে যত নরক্ত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে কলিযুগের সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ বলিয়া আখ্যা দিতে না পারিলেও, ইহা যে মানব সমাজের প্রচলিত রীতিপদ্ধতির অদলবদলকারী একটা অসাধারণ ঘটনা, এমন কথা বলিবার হেতু ইহার ভিতরে যথেষ্ট নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া

যাইতেছে। এজন্য এই যুদ্ধটাকে কলিযুগের একটা অধ্যায়ের উপসংহার পরিজ্ঞাপক ঘটনা বলিয়া আমরা মনে করিলেও করিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চারিযুগে চারিটা মহাযুদ্ধ চতুর্ব্বিধ স্বতন্ত্র ভিত্তি ভূমির উপর অধিষ্ঠিত। স্থূল দৃষ্টিতে বড় অধিক কিছু পার্থক্য না থাকিলেও, যে কোন জীবের বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য অবস্থার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মভাবে যেমন একটা পার্থক্য প্রবহমান থাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই চারিযুগ ব্যাপী মানবসমাজের যুদ্ধব্যাপারের বাহ্যিক পার্থক্যভাব বিশেষ কিছু না থাকিলেও উহার মূলগত যে একটা সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য রহিয়াছে, ইহা একটু চিন্তা করিলে সুস্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে। কেবল মানুষ বলিয়া নহে, জীব মাত্রেই আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রথমে আহারের জন্য ব্যস্ত থাকে, তৎপরে আপন জীবধারা রক্ষার জন্য স্ত্রীসঙ্গলিপ্সাতে অভিভূত হয়; তাহার শান্তি হইলে অপত্য সংরক্ষণার্থে বাসস্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এবং পরিশেষে বিশ্রাম লাভের জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। চারিযুগে যে চারিটি প্রধান যুদ্ধের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ভিতরেও এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের একটা অদ্ভুত বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। আহার্য্য বস্তু আয়ত্তাধীন করিবার জন্য অর্থাৎ অমৃত লইয়া দেবাসুরের মধ্যে প্রথম সংগ্রামের উৎপত্তি হইয়াছিল; স্ত্রী লইয়া রামরাবণের যুদ্ধের সংঘটন হয়; বাসস্থান লইয়াই যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল, তাহা মহাভারত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। চতুর্থ বিষয়িনী কথা পরে আলোচ্য।

আর এক দিক্ দিয়া এ ব্যাপারটা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। ব্রাহ্মণ্য ভাবের যুদ্ধ, ক্ষাত্র ভাবের যুদ্ধ এবং বৈশ্য ভাবের যুদ্ধ অতীত তিন যুগের তিন মহাযুদ্ধের মূলজ্ঞাপক তত্ত্ব। তাহা হইলে কলিযুগের বর্ত্তমান মহাযুদ্ধকে শূদ্র ভাবাত্মক যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত ; কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের মূলীভূত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে উপস্থিত হইলে ইহাকে শূদ্র ভাবাত্মক যুদ্ধ না বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইহাকে বৈশ্য ভাবাত্মক যুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতে হয়।

যুগযুদ্ধ ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে কথাটা আরও একটু বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন ; চারি যুগের আদ্যন্ত অবস্থাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। সত্য যুগের প্রারম্ভে ঋষিদের অভ্যুদয় সময়ে যুদ্ধ থাকিতে পারে না। কেননা সাত্ত্বিকযুগে যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সত্ত্বগুণের কার্য্য জ্ঞান, সন্তোষ ইত্যাদির বিকাশ। সত্ত্বগুণের মধ্যে রজোগুণ সংমিশ্রিত হইলেই রজোগুণের প্রভাবে চঞ্চলতা, উদ্যম, শৌর্য্য ও লাভাকাঙ্ক্ষাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবগণ স্বকীয় বাসনা পরিপূরণের অন্তরায় স্বরূপ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়। এই জন্য দেবাসুর সংগ্রাম কালে দেব দানব উভয় দলের মধ্যেই রজোগুণের প্রভাব যে সময়ে বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে, তখনই যুদ্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। তখনও সত্ত্ব গুণের সমাবেশ অধিক পরিমাণে থাকায় অত্যধিক স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, কপটতা, প্রবঞ্চনাদি অধিক পরিমাণে তখন পরিলক্ষিত হয় নাই। মধুকৈটভ, গয়াসুর প্রভৃতির যুদ্ধ

সময়ে ও তাঁহাদের আচরণে সরল সত্যনিষ্ঠাই তাহার প্রমাণ। চণ্ডীতে লিখিত আছে, মধুকৈটভের সহিত স্বয়ং নারায়ণ পঞ্চসহস্র বৎসর যুদ্ধ করিয়াও যখন তাহাদিগকে পরাভূত করিতে অক্ষম হইলেন, তখন ঐ অসুরদ্বয়ই বিষ্ণুকে প্রসন্ন ভাবে বর দিতে যাইয়া বলিলেন "তোমার যুদ্ধ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব বর প্রার্থনা কর।" নারায়ণ তাহাতে উত্তর করিলেন, "তোমরা আমার বধ্য হও, এই বর চাহি।" অসুরদ্বয় অবলীলাক্রমে "তথাস্তু" বলিয়া সম্মত হইলে তাঁহারা বিষ্ণুর জানুপ্রদেশে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। গয়াসুরের ইতিহাসও হিন্দুসাধারণের অবিদিত নহে।

রামায়ণের বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধ ব্যাপারেও এইরূপ সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের কার্য্যই আমরা দেখিতে পাই। তবে ত্রেতা রজঃপ্রধান যুগ বলিয়া সত্ত্বগুণের বিকাশ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্প। রাক্ষস জাতির মধ্যেও ভক্তি, তপস্যা, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি সত্ত্বগুণজাত সদ্বৃত্তি সমূহের বিকাশ ন্যূনাধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। বিভীষণ, সরমা, তরণীসেন, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ ও মন্দোদরীর অনেক কার্য্যে অনেক সময় অল্পাধিক পরিমাণে এই সকল সদ্বৃত্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। হনুমানাদি বানর জাতির মধ্যে ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব অধিকতর পরিমাণেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রাদিতে ত্রেতাযুগের যুগপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহাদের অলৌকিক স্বার্থত্যাগ, পিতৃমাতৃভক্তি, দাম্পত্য মাধুর্য্য, সর্ব্বমঙ্গল ভাব, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য, সত্যনিষ্ঠা ও সত্য রক্ষার জন্য অকাতরে জীবনদান ইত্যাদি উচ্চ সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ

প্রবন্ধে সে সকল কথা বিস্তারিত রূপে বর্ণনীয় নহে বলিয়া তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক।

মহাভারতোল্লিখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে পূর্ব্বাপেক্ষা সত্ত্বগুণের প্রভাব মানব সমাজে আরও হ্রাস এবং রজোঃগুণের প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। কাজেই দুর্য্যোধনাদির কার্য্যে কুটিলতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, আততায়িকা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময় কলির প্রধান গুণ তমোভাব তখন রজোগুণের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এজন্য সাম্রাজ্যলিপ্সা ও সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য নানা প্রকার অসদুপায়ানুষ্ঠানে কৌরবেরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুরাগাদি সদ্‌গুণরাজি, তৎকালে সাধারণ যুগ প্রভাবকে কিছু অতিক্রম করিয়াছিল; তথাপি তাঁহারাও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পূর্ণমাত্রাতে ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে, ভীম যখন দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম যুদ্ধে আহত করেন, তখন বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। উহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে; এখন এরূপ অধর্ম্ম যুদ্ধ চলিতে থাকিবে"। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অধর্ম্ম প্রভাবের পূর্ণাভিব্যক্তি, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। দ্বাপর যুগের শেষে যে রজস্তমোগুণের পরিণতিতে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই পূর্ণবিকাশে এক্ষণে মানবসমাজে এই লোকক্ষয় সংঘটন হইতেছে। এক সম্মিলিত "মিত্রশক্তি" সমূহের প্রজাবর্গই প্রায় ৭৬ কোটী অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর লোক-

সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক। সমুদ্রতলে, ভূগর্ভে, বিমানে ও প্রান্তরে বহুস্থানে সুদূরব্যাপী হইয়া প্রায় সমস্ত পৃথিবীই এই রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইচ্ছার সঙ্গেই হউক বা অনিচ্ছার সঙ্গেই হউক, কোন না কোনরূপে এই মহাযুদ্ধে কোটি কোটি নরনারী সংলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অভূতপূর্ব্ব বলিয়া বোধগম্য হইলেও ইহাই যে কলির চূড়ান্ত যুদ্ধ, তাহা কেহই এখনও সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন না। ফলতঃ তমঃ ও রজোগুণের অতি প্রাবল্য বশতঃ এই মহাযুদ্ধ ক্রমেই অধিকতর বিশালাকার ধারণ করিতেছে এবং আরও করিবে। ইহার উপসংহার কোথায় ও কিভাবে হইবে, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণের প্রকাশে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ অসম্ভব, তেমনি ষোলআনা তমোগুণের ফলেও যুদ্ধাদি ঘটিতে পারে না। কারণ তমোগুণের কার্য্য আলস্য, জড়তা, প্রমাদ, নিদ্রা, মোহ প্রভৃতি। তমোগুণ উত্তেজনা কার্য্যে অসমর্থ। এজন্য কলির শেষে শূদ্র ভাবের যখন পূর্ণ বিকাশ হইবে, তখন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধ ব্যাপারের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের বর্ণগত ভাবের কথা আনিয়া পাড়াতে আধুনিক শিক্ষিত কোন কোন পাঠকের ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইতে পারে। ব্রাহ্মণের চক্ষু লইয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে ইহার ভিতর হাসিবার কথা কিছুই নাই। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারের মধ্যে চারিটা পৃথক ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বুঝাইবার সুবিধার জন্য ইহারই নাম চারি বর্ণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত

হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রধান ভাবকে ব্রাহ্মণ্যভাব, সত্ত্ব-রজঃ-প্রধান ভাবকে ক্ষাত্রভাব, রজঃস্তমঃ-প্রধান ভাবকে বৈশ্যভাব এবং তমঃ-প্রধান ভাবকে শূদ্রভাব বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই চারি ভাবের বিকাশ যে কেবল হিন্দুজাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে; পৃথিবীর অন্যান্য নরনারীদের মধ্যে—এমন কি, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ উদ্ভিদাদির মধ্যেও ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখাইয়াই প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের সঙ্কলিত শাস্ত্রগ্রন্থে বৃক্ষলতাগুল্মাদিকেও এমন কি, অস্ফুট চৈতন্য হীরা পান্না নীলা প্রভৃতি রত্নরাজিকেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। গ্রহোপগ্রহগণ মধ্যেও তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভেদে বর্ণ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের প্রতি স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের প্রত্যেক অণুর সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। কাজেই সত্যযুগের মহাযুদ্ধকে ব্রাহ্মণ্য-ভাবের যুদ্ধ, ত্রেতার মহাযুদ্ধকে ক্ষাত্রভাবের যুদ্ধ, দ্বাপরের মহাযুদ্ধকে বৈশ্যভাবের যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করাতে আমরা যে বড়ই একটা দোষাবহ কার্য্য করিলাম, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে। ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধকে শূদ্র ভাবাত্মক যুদ্ধ বলিয়া যে আমরা মনে করিতে পারি না, এ কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কাজেই এ যুদ্ধকে কলিযুগের মহাযুদ্ধ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যে বৈশ্যভাবাত্মক প্রবাহের প্রথম উদ্গম উপলব্ধি হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারই পূর্ণ বিকাশ

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এ কথা কেন বলিতেছি, এখন তাহাই বলিব।

ব্রাহ্মণ্যভাবের কার্য্যের পরিচায়ক লক্ষণ সত্যে পূর্ণনিষ্ঠা, অকপটতাচরণ, উদারতা, সহৃদয়তা বর্ত্তমান যুদ্ধে এককালীন অদর্শনীয় বস্তু বলিলেও চলিতে পারে। বীরত্ব, শূরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সকল গুণে ক্ষাত্রযুদ্ধ প্রশংসিত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রের কোন অঙ্গনেই তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে না। পক্ষান্তরে পয়সাকড়ি গণনার ভিতর দিয়া এই যুদ্ধের প্রবাহ যে পূর্ণ বেগে চলিতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পশুপক্ষীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি ভাবের বিকাশ আছে। ইন্দুর জাতির মধ্যে বৈশ্যভাবের বিকাশ অধিক। সঞ্চয়শীল সুচতুর মূষিকদল যেমন মাটীর ভিতরে গর্ত্ত করিয়া আপনাদের বাসদুর্গ প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং মুহুর্ম্মুহু তাহা হইতে বহির্গত এবং আপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলেই তাহার মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে জর্ম্মান্ জাতি ট্রেঞ্চ যুদ্ধ প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া সেই মূষিক-নীতিরই কতকটা অনুসরণ করিতেছেন। ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জর্ম্মণ প্রবর্ত্তিত সেই ট্রেঞ্চযুদ্ধ প্রথা সাদরে পরিগ্রহ করিয়াছেন। এদিক দিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলেও বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধকে বৈশ্যভাবাত্মক যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া লইতে বাধা নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধাঙ্গনে অবতীর্ণ একপক্ষ অপর পক্ষকে নানা যুক্তি তর্ক সাহায্যে যতই অসভ্য অপদার্থ লোভী দুরাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে

চেষ্টা করুন না কেন, ব্যবসা বাণিজ্য ঘটিত স্বার্থ চিন্তাই যে সকলেরই পশ্চাতে অন্তর্নিহিত প্রবর্ত্তক শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া এ ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এ অবস্থায় এ যুদ্ধকে বৈশ্যভাবাত্মক যুদ্ধ ভিন্ন আর কি আখ্যাতে আমরা অভিহিত করিতে পারি ?

বৈশ্য ভাবাত্মক যুদ্ধ বলিয়া বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধকে গণ্য করা হউক বা নাই হউক, দেশ বিশেষের বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোন অংশের সঙ্কোচন আর কোন অংশের অসাধারণ প্রসারণ যে ইহার একটা আশু ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে এখন স্বীকার করিতেই হইতেছে। এই যুদ্ধের পরিণাম ফলে কোন কোন দেশের বাণিজ্য ব্যবসায় ঘটিত সম্পদ যে এককালে ধ্বংস হইয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কাও অনেকের মনে উদয় হইতেছে। ব্যবসার বুদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যাঁহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বহুকাল হইতে অভ্যস্ত, তাঁহারা এ যুদ্ধের ভাবী ফলের চিন্তার মধ্যেও যে বাণিজ্য ব্যবসায়েরই ক্ষতি বৃদ্ধির একটা বিকট বিভীষিকা দেখিতে পাইবেন, ইহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। বাস্তবিক, এ যুদ্ধের পরিণাম ফল কেবল দোকানদারের দাঁড়িপাল্লার হেরফের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিবে অথবা বিশ্বব্যাপী—সমগ্র সভ্য মানব সমাজের মানসিক চিন্তা প্রবাহের একটা বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটন করিবে, তাহা এখন একটু ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণের দর্শনভূমি হইতে যাঁহারা এ যুদ্ধের ভাবী ফলটীকে অঙ্ক কসিয়া বাহির করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগকে ইয়োরোপীয়

ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। ব্রাহ্মণের বিচারে, ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের পথ-প্রদর্শক কেবল তিনিই হইতে পারেন, যাঁহার অতীত অনুভূতি আর বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ক অভিজ্ঞতা, অভ্রান্ত জ্ঞানভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এক এবং দুইয়ের গণিত যোগফল যেরূপ "তিন" অঙ্ক সুনিশ্চিত, তেমনি অতীত এবং বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতাকে একত্রীভূত করিয়া তাহারই যোগফল স্বরূপ নির্ভুল ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তকে যে অতি সহজে অঙ্ক কসিয়া টানিয়া বাহির করিতে পারা যায়, একথা কেবল প্রাচীন ঋষিরাই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত এই বিশুদ্ধ গণনা-ধারা ধরিয়া আমরা গণনা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, এ মহাযুদ্ধের ভাবী ফল কতকটা আমরাও স্থির করিয়া লইতে পারি। অতীতের অক্ষয় ইতিবৃত্ত আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে আর বর্ত্তমানের অবস্থা ঘটিত জ্ঞান আমাদের চক্ষুর উপরেই কতকটা ভাসিতেছে, এখন এ দুইয়ের যোগ সাধন করিয়া অঙ্কফল বাহির করিবার প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিলেই আমরা এ যুদ্ধের ভাবী ফল চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে দেখিতে পাইব।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ পুরাণাদি অনুশীলন করিয়া আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে, এক একটা যুগে এক একটা মহাযুদ্ধ হইয়া তৎকালীয় অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়াছে অথবা অবস্থার রূপান্তর ঘটাতেই ঐরূপ মহাযুদ্ধ সকলের অবতারণা সে সময়ে হইয়াছিল। যাহাই হউক, সাত্বিক ব্রাহ্মণ্য ভাব হইতে ঋষি-সন্তানগণ যখন নামিয়া পড়িলেন, যখন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অধিক মাত্রাতে ক্ষত্রিয় ভাবের সঞ্চার

হইল অর্থাৎ প্রাচীন মানব সমাজে রজোগুণ যখন অত্যধিক প্রসারিত হইয়া পড়িল, তখনই তাহার পরিবর্তন সাধন জন্য প্রকৃতি দেবী একটা বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটন করিয়া দিলেন। এই ভাবে মানব সমাজ এক একটি স্তরের নিম্নে যখনই নামিয়া পড়িতে লাগিলেন, তখনই প্রকৃতি-দেবীর ইঙ্গিতে এক একটা মহাযুদ্ধের সংঘটন হইয়া মানব রঙ্গভূমির পট পরিবর্তন হইয়া যাইতে লাগিল। সত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রথম অভ্যুদয়ে সংসারে প্রজাবৃদ্ধি কার্য্যের বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল, সৃষ্টি প্রবাহের বাধা উপস্থিত হইল, কাজেই তাহার সংশোধন হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই পরিবর্তন সময়ে একবার মহাযুদ্ধ সংঘটন হইয়া রজোগুণ প্রধান ক্ষাত্র শক্তির অভ্যুদয় হইল। দ্বাপরের শেষে ক্ষাত্রশক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তিতে একটা ভীষণ সংঘর্ষণ হইয়া ক্ষাত্রশক্তি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া পড়িল আর সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্য শক্তিও নিস্তেজ দশা প্রাপ্ত হইল। উহার ফলে কিছুদিনের জন্য শূদ্র শক্তির অভ্যুদয় হইল। কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না। বৈশ্যশক্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়া শূদ্র শক্তিকে নিস্তেজ করিয়া নিজ আধিপত্য বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিল। এখন জগৎব্যাপী এই বৈশ্যভাবের বিপুল প্রবাহের তলে পড়িয়া যুগধর্ম্মে স্বভাবতঃ ক্ষীণভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও ক্ষাত্র শক্তি আপন অস্তিত্ব একরূপ হারাইতে বসিয়াছে। এ সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে উহাদের আর একবার ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। স্রোতোগতি না ফিরিলে সে চেষ্টা করিবার সাধ্য উহাদের কাহারই নাই। এখন সেই জন্য প্রকৃতি দেবীই বুঝি বা বিশ্বের

কর্ম্মভূমিতে মহাযুদ্ধের এক মহা আবর্ত্তন তরঙ্গ তুলিয়া স্রোতোগতি ফিরাইতে বসিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, এ বিশ্বরাজ্যে জড়মুখী শক্তিই হউক, আর চৈতন্য বিকাশিনী শক্তিই হউক, যে কোন একটা প্রবল শক্তি বিপুল আয়তন ধারণ করিয়া তাহার স্বাভাবিক কার্য্য সীমা অতিক্রম করিয়া জগতে একটা বিপুল বিপর্য্যয় ঘটাইতে যখনই উপস্থিত হয়, তখনই প্রকৃতি দেবী আর একটা ততোধিক প্রবল শক্তিকে অন্য স্থান হইতে আনয়ন করিয়া সম্মুখে নামাইয়া উহাকে সুসংযত করিয়া দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাপারকেই পুরাণে অবতার-প্রকাশ বলিয়া কথিত হয়। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানবিৎগণ আধ্যাত্মিক রাজ্যের এই সকল কার্য্যের গুঢ় রহস্য মধ্যে এখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টিতে একটা স্থান অত্যধিক উষ্ণ হইয়া উঠিলে স্বভাবতঃই সেখানে অন্য স্থান হইতে শীতল বায়ুর সমাবেশ হয় ও তন্নিবন্ধন ঝটিকার উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্ম জগতেও এই ধারা কেন? আমরা প্রকৃতি দেবীকে একটা জড় নিয়মের অধিক আরও কিছু মনে করিতে অভ্যস্ত, তাহাতেই বিশ্বসংসারে একটা জাতির বা একটা জীবের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে তৎক্ষণাৎ সে ক্ষেত্রে আর এক শক্তির অভ্যুদয় দ্বারা তাহাকে খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা হইতেছে দেখিতে পাই। এই ভাবে প্রকৃতিদেবীর বিশ্বশাসন-সংরক্ষণ কার্য্য অবিরত সম্পাদিত হইতেছে বলিয়াই, আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধিকে সংযত করিবার জন্য ক্ষাত্র শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, আবার সেই ক্ষাত্রশক্তি কালক্রমে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে তাহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বৈশ্যশক্তির বিকাশ

সেই প্রকৃতি দেবীই করিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে কোথায় বা তাঁহাকে আদ্যাশক্তি, কোথায় বা তাঁহাকে পরাশক্তি, কোথায় বা তাঁহাকে বিষ্ণুমায়া, কোথায় বা তাঁহাকে আর কিছু নামে পরিচিত করা হইয়াছে। ফলতঃ সেই মানববুদ্ধির অবোধ্যা, মানব দৃষ্টির অগম্যা পরমাপ্রকৃতিই আমাদের এই বিশ্বসংসারের বিশাল রঙ্গভূমির পটান্তরালে সংস্থিতা থাকিয়া সকলের সর্ব্ববিধ নৃত্য ক্রিয়ার সুর তাল লয় সর্ব্বদা যোগাইতেছেন। বিশ্বপ্রসারিত বৈশ্য শক্তির বিপুল প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য এই মহাযুদ্ধের অবতারণা কি না, একথার একমাত্র সঠিক উত্তর কেবল তাঁহার কার্য্যফলেই দিতে সক্ষম। তবে চতুর্দ্দিকের বাহ্যিক ব্যাপার সকল দেখিয়া আমরা এখন যতদূর অনুমান করিতে পারিতেছি, তাহাতে আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধা নাই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাযুদ্ধের ন্যায় এ মহাযুদ্ধও সভ্য জগতের ভাব প্রবাহের একটা মহা পরিবর্ত্তন সাধন করিবে। কি ভাবে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, এখন তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

অঙ্ক কসিবার স্থূল ধারা ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিতে উপস্থিত হইলে এ কথার উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে, এ মহাযুদ্ধের ফল,—জগতে বৈশ্যবৃদ্ধি দমন এবং শূদ্র শক্তির অভ্যুদয়। কেননা কলিযুগে শূদ্রশক্তির অভ্যুদয় স্বাভাবিক এবং এই নিয়মানুসারেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তি উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়াতে শূদ্র নন্দ রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ হইবে কি না সন্দেহ স্থল; পুরাণের ভবিষ্যৎবাণী একথা ঘোষণা করিতেছে সত্য

যে,—কলিযুগে শূদ্রশক্তির প্রাধান্য হইবে *, কিন্তু কলিযুগের সেই দিন এখনও বহুসহস্র বৎসর দূরে অবস্থিত। বৎসরব্যাপী শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তাদি ছয়ঋতু যেমন অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতি দিবারাত্রের মধ্যেও একবার করিয়া আবর্ত্তন করে, তেমনি এক একটা যুগের মধ্যেও আবার সত্য, দ্বাপরাদি চারিযুগের সূক্ষ্ম প্রভাব পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানুষের জীবনে, বৃদ্ধাবস্থাতেও বাল্যের বা যৌবনের চাঞ্চল্য অতি সূক্ষ্মভাবে কখনও কখনও আবার পরিস্ফুট হইয়া উঠে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিযুগের মধ্যেও অতি অল্পকালের জন্য সময়ে সময়ে অন্যযুগের আভাস পরিস্ফুট হইয়া যে উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। সেইরূপ একটা পরিবর্ত্তনের সময় সম্প্রতি সমুপস্থিত কিনা, ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। যেমন আমগাছে মুকুল উদ্গম দেখিলে বসন্ত ঋতুর সমাগম মনে হয়, তেমনি মানব সমাজে ইদানীং কাউন্ট টলষ্টয়, অগস্ত কোমৎ প্রভৃতি ঋষিকল্প মহাপুরুষদের আবির্ভাব দেখিয়া আমরা সহজেই মনে করিতে পারি, কালস্রোতের গতি একটু পবিত্র দিকে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে। ঘোর গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যেও যেমন সময়ে সময়ে রাত্রে একদিন ঝড় বৃষ্টি করিয়া পরদিন প্রভাত সময়ে কিছুকালের জন্য বসন্তের মধুর বাতাস উপভোগের একটু সৌভাগ্য প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে প্রদান

* অধুনা ইয়োরোপে Labouring class বা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় দেখিয়া পুরাণ বর্ণিত শূদ্র শক্তির প্রাধান্য লাভের দিন নিকটবর্ত্তী মনে হইতে পারে। শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে শূদ্র বর্ণের স্থানীয় মনে করিতে পারা যায়। কিন্তু ইয়োরোপের শ্রমজীবীরা কিয়ৎ পরিমাণে এখনও বৈশ্যভাবাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছেন।

করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই প্রখর কলিযুগের মধ্যেও দুইচারি সহস্র বৎসরের জন্য একটু সত্ত্বগুণ-প্রধান যুগান্তরের শান্তিসুখ উপভোগের সৌভাগ্য মানব জাতিকে তিনি না দিতে পারিবেন কেন? প্রবল জ্বর পীড়াতে আক্রান্ত রোগীকেও মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম সুখ উপভোগ করিতে দিয়া তাহার কষ্টভোগের কালকে বিস্তৃত করিয়া দেওয়াই যাঁহার কার্য্য, সেই প্রকৃতিদেবী কলির আয়ুষ্কাল অসময়ে যাহাতে শেষ না হইয়া যায়, এজন্য মধ্যে মধ্যে মানবসমাজে অন্য যুগের অবস্থা আনিয়া দিয়া ইহার ভোগকালের পরিমাণ স্থির রাখিতে প্রযত্না না হইবেন কেন? এই দৃষ্টিতে বিচার করিতে উপস্থিত হইলে আমরা বুঝিতে পারি, এই যুদ্ধের চরমফল মানবসমাজ ধ্বংসকর নহে—পরন্তু রুগ্ন মানবসমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই ইহার অবতারণা। এই যুদ্ধে বহু নররক্তপাত হইতেছে দেখিয়া যদিও আমরা মর্ম্মাহত হইতেছি, কিন্তু প্রকৃতিদেবীর কোন্ কার্য্য মধ্যে কোন্ সময়ে কি মহৎ অভিপ্রায় লুক্কায়িত থাকে, তাহা বুঝিতে আমরা যখন অক্ষম, তখন ইহা আশু ক্লেশদায়ক হইলেও ইহার ভাবী ফল মানবসমাজের কল্যাণকর হইতে পারে. ইহা মনে করিয়া আমরা চিত্তকে প্রবোধ দিতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে করিতে পারি—অমানিশাতে একটা প্রবল ঝটিকার অবসানে যেমন সুনির্ম্মল আকাশে আবার তারকারাজি প্রকাশ পায়, বাস-গ্রাম দগ্ধ হইলে যেমন নানা আধিব্যাধির বীজসমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া গ্রাম আবার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর হয়, বন্যাতে দেশ প্লাবিত হইবার পরে যেমন নষ্ট শস্যক্ষেত্র নূতন পলি মাটি সমাগমে দ্বিগুণ উর্ব্বর

হইয়া উঠে, তেমনি এই মহাযুদ্ধে নানাদেশ ও নানা জাতিকে বিদ্ধস্ত করিলেও ইহার অবসানে মানবসমাজ এক নবজীবন লাভ করিয়া নূতন কার্য্যক্ষেত্রে আবার নব উদ্যমে অবতরণ করিবে আর সেই সময়ে সেই নব কার্য্যক্ষেত্রের উপরে নব শাসনদণ্ডের শীর্ষদেশে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া দিয়া মানব আর একবার স্বপদে আরূঢ় হইতে সচেষ্ট হইবে।

সমাপ্ত।

